বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা | কঙ্কর সিংহ

বাংলাদেশ

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা

কঙ্কর সিংহ

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

ISBN 984-70000-0198-6

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

বাংলাদেশ
সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ

কঙ্কর সিংহ

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. 94802
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ
কঙ্কর সিংহ

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কম্প্লেক্স, ২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু। বর্ণবিন্যাস : আবির কম্পিউটার। মুদ্রণ : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ মুদ্রণ বিভাগ। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

BANGLADESH SAMPRODAYIKOTA O MOULOBAD by Kankar Singh. Published by : Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prakash, Concord Emporium Shoping Complex, 253-54 Elephant Road, Katabon, Dhaka-1205. Cover design : Charu Pintu. Copyright : Author. Date of Publication : February 2014.

Price : Tk. 160.00, US $ 4.00

ISBN : 984-70000-0198-6

'স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখি ঢেকে'
বিজন কুমার অধিকারী
দীপক রঞ্জন বিশ্বাস
বিমল কুমার ঘোষ
স্মরণীয়েষু–

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ঢাকা, থেকে প্রকাশিত–

সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট (১৯৯৭, ২০০৭)
রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (১৯৯৯)
নির্বাচন, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৯৯)
বঙ্গভঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ (২০০১, ২০১১)

কলকাতা থেকে প্রকাশিত–

আমি শূদ্র আমি মন্ত্রহীন (২০০২, ২০১০)
মনুসংহিতা এবং শূদ্র (২০০২, ২০০৬)
মনুসংহিতা এবং নারী (২০০৫, ২০১০)
বাংলার রেনেসাঁস : অন্ত্যজ আর শূদ্র (২০০৫)
ইসলাম ও পরধর্ম (২০০৫)
ইসলাম ও নারী (২০০৮, ২০১০)
ইসলাম ও কোরান (২০০৮, ২০১০)
ধর্ম ও নারী : প্রাচীন ভারত (২০০৯)
দেশ ভাগ : সংখ্যালঘু সঙ্কট-বাংলাদেশ (২০১১)

অনুবাদ :

বার্ট্রান্ড রাসেল : কেন আমি ধর্মাবিরোধী (২০০৯)
বার্ট্রান্ড রাসেল : সুখের সন্ধানে (২০১০)
সিমোন দ্য ব্যভোয়ার : দ্বিতীয় লিঙ্গ (২০১০)
বার্ট্রান্ড রাসেল : বিবাহ ও নৈতিকতা (২০১১)

নিবেদন

বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সাময়িকীতে ২০০৮ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কোনও কোনও প্রবন্ধের রচনাকাল অবশ্য প্রকাশের অনেক আগে। তবুও প্রবন্ধগুলোকে সংকলনে তুলে দেয়া হয়েছে প্রকাশের কাল অনুযায়ী। বিভিন্নসময়ে রচিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কোন বিষয়গত ঐক্য না থাকলেও একটা মূল সুর আছে। বিভিন্ন সময়ে রচিত বলে প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পুনঃরুক্তি ঘটেছে। সেজন্য পাঠকদের কাছে আমি মার্জনাপ্রার্থী। ১৯৭১ সালে এক নদী বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদ মুক্ত হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সেই স্বাধীনতার পরম অর্জনকে অল্পদিনের মধ্যে শকুনীরা খামছে ধরেছে। ক্ষত-বিক্ষত করেছে রাষ্ট্রীয় মূল নীতিকে। কলংকিত করেছে তার সংবিধানকে। স্বাধীনতার চার দশক পরেও আবহমান বাঙালি ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার কিভাবে এবং কতটুকু গ্রহণ করবে সেই ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনও সবকিছু নিয়ে চরম বিতর্ক। যা কিছু স্বাধীনতার অহংকার তা নিয়ে দুই দলের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। তারপরও মানুষ স্বপ্ন দেখে নতুন দিনের। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আলোর পথে। দূর হবে তমসা, জয়ী হবে অসাম্প্রদায়িকতা, পরাজিত হবে মৌলবাদ। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলো যদি পাঠকদের ভাল লাগে আমি ধন্য হব। পরম যত্নে এই সংকলন প্রকাশ করার জন্যে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশের কর্ণধার শ্রী কমল কান্তি দাসের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ফেব্রুয়ারি ২০১২

কঙ্কর সিংহ

সূচি

বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিদূষণ-নতুন রূপে / ৯
লালন বিদূষণ নতুন রূপে / ২০
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশে নতুন পরিচয় / ২৫
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ : বখতিয়ার খিলজি মুসলমানদের মুক্তিদাতা / ৩৬
বাংলাদেশ : ধর্ম-সংস্কৃতি-উত্তরাধিকার / ৪১
রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ / ৫২
বাংলাদেশ ও বাউল ভাস্কর্য / ৫৭
বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত / ৬৬
বাংলাদেশের জাতীয় ধ্বনি-জয় বাংলা / ৭৮
বাংলাদেশ : দুই শূদ্রের বিরোধ / ৮৪
বাংলাদেশ : ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা বোধ / ৯০

বাংলাদেশে রবীন্দ্র-বিদূষণ—নতুন রূপে

বার বার ফিরে আসে ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী, বাঙালির, বাংলাভাষীর গর্ব তিনি। সেখানে ধর্ম-বর্ণ-জাতি (nation) একাকার। যতদিন একজন বাংলাভাষীও বেঁচে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পথ চলায় আকাশ প্রদীপ হাতে নিয়ে পথ দেখাবেন।

কিন্তু বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আবার নতুন বিতর্ক। তিনি বাংলাদেশী মুসলমানদের বরেণ্য হতে পারেন না। মৌলবাদীরা আবার নতুন করে এই প্রশ্ন তুলে ধরছেন। এই ব্যাপারে তাদের মুখপত্র বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত, বিশেষ মহলে বহুল প্রচারিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র 'ইনকিলাব'। রবীন্দ্রনাথ বিধর্মী। যে দেশের রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম', সেই দেশের বরেণ্য কবি হতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায়ও তাঁর জন্ম নয়। তিনি ভিন্ন এক দেশের কবি। যতই তাঁর প্রতিভা মহাকালকে ছাড়িয়ে যাক তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্য নন। তাঁর উত্তরাধিকার বাংলাদেশ বহন করতে পারে না। ইনকিলাব গোষ্ঠী সচেতনভাবে আহ্বান জানাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার জন্যে।

পূর্ব পাকিস্তানেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেকভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল। সরকারী পর্যায়ে নিষিদ্ধও করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। তখন মনে করা হয়েছিল পাকিস্তান নামে রাষ্ট্রটির সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখা প্রয়োজন। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য অমুসলমান কবির সাহিত্যের আদর্শ পাকিস্তানী মুসলমানদের তামদ্দুনিক (সাংস্কৃতিক) স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করবে বলেই মনে করেছিল রাষ্ট্রের কর্ণধাররা। সকলকে না করলেও তারা বশ করতে পেরেছিল পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বাঙালি মুসলমান কবি সাহিত্যিককে। আমরা সৈয়দ আলি আহসানকে স্মরণ করতে পারি।

> "... আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখবার জন্যে যদি প্রয়োজন হয় আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন অনেক বেশি।"[১]

পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রবর্জনের ইতিহাস নিয়ে আমরা কোন আলোচনায় যেতে চাই না। পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলন একদিন রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের অঙ্গন থেকে প্রশস্ত রাজপথে নিয়ে এসেছিল। আমবা তো অনেকদিন ছেড়ে এসেছি পূর্ব পাকিস্তান। রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়েই তো মুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ।

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাশি।"

এই গানে সোনার বাংলার যে রূপ তা নাকি বাংলাদেশের বৃহত্তর ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্যেই বরণীয় নয়। এই গান মুসলমানদের ধর্মবিরোধী। এই জাতীয় সংগীত গাইলে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের দুর্বল মানসিকতার জন্যে তখন মুসলমানের ঈমান আকীদার বিরুদ্ধে এই গানকে জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই নির্বাচন ছিল ভুল। ক্ষমাহীন এক অপরাধ। এখন সময় এসেছে তওবা করে সেই ভুল সংশোধনের।

'ইনকিলাব' এই ভাবেই বোঝাতে চাইছে অনেকদিন থেকে। শুধু জাতীয় সংগীত পরিবর্তন নয়, বিধর্মী রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার কথাও বলছে তারা। তাদের লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী। উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তারা বাংলা ভাষার, বাঙালির মহত্তম এই কবির চরিত্রহনন করে চলেছে দিনের পর দিন, নানাভাবে। তারা প্রমাণ করতে চায় রবীন্দ্রনাথকে যত বড় করে দেখানো হয়, আসলে তিনি তা নন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যাচারী জমিদার। চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তাঁর সাহিত্য পৌত্তলিকতার জয়গানে মুখরিত। মুসলমানের ধর্ম-নৈতিকতা-আচার-অনুষ্ঠান সব কিছুর সাথেই রয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধ। তাহলে কেন মুসলমানরা ধারণ করবেন রবীন্দ্রনাথকে?

ইনকিলাবের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি পাতায় দিনের পর দিন প্রচারিত হয় রবীন্দ্র বিদূষণ। উপসম্পাদকীয়তে থাকে রবীন্দ্রনিন্দা। তাঁর রুচি বিবর্জিত এক নমুনা হল—

> "রবীন্দ্র সাহিত্যে 'ভাই' নাই 'দাদা' আছে, 'আপা' নাই 'দিদি' আছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে 'চাচা' নাই 'কাকা' আছে। 'খালা' নাই 'পিসী' আছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে 'তসবীহ' নাই 'পৈতা' আছে। 'টুপী' নাই 'টিকি' আছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে 'রাম' আছে 'রসুল' নাই। 'ভগবান' আছে 'আল্লাহ' নাই...।"[২]

এই ধরনের রবীন্দ্রনিন্দায় কোন সাহিত্য নেই। যা রয়েছে তা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। সাধারণ মুসলমান পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে চায় ইনকিলাব।

আর একটি 'উন্নততর' নমুনা হল,

> "একশ্রেণীর লোক আছে 'বিশ্বকবি' বলতে অজ্ঞান। কিন্তু বিশ্বের মানুষ দূরে থাক, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণের কথা, সমাজের সাধারণ নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, দুঃখী মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের চিত্রও তার বিশাল সাহিত্যে স্থান লাভ করেনি। মুসলমান জমিদার রেজা খাঁর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের দখলিস্বত্ব কায়েম হয়েছিল। বীরভূমের মুসলিম জমিদারের জমিতে কবির স্বপ্নের শান্তিনিকেতন গড়ে উঠলেও বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলমানরা কেবলই সরকার, খানসামা নৌকার মাঝি পাইক বরকন্দাজ জাতীয় তুচ্ছ হীন চরিত্র ব্যতীত কোন মহৎ ভদ্র মানবিক চরিত্র হিসাবে স্থান পায়নি।"

এই বক্তব্যও একাডেমিক নয়। এখানে সাহিত্যের সততাও নেই। একে কী রবীন্দ্রবিরোধিতা বলে গ্রহণ করব না রবীন্দ্রবিদ্বেষ বলে ধরব!

আরো একটি নমুনা,

> "মুসলিম নিধনকারী মারাঠা শিবাজীর পূজারীদের যাবতীয় স্বার্থের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণকারী, একান্তভাবেই হিন্দুমানসে পরিচালিত এবং মুসলিম স্বার্থবাহক ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতাকারী চূড়ান্ত মাত্রায় হিন্দু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কোনোক্রমেই আমাদের নিকট আদর্শ নন। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার স্বপ্ন ও গান বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সৃষ্ট মুসলিম পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের উৎখাতের লক্ষ্যে এবং অখণ্ড রামরাজত্বে হিন্দু বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছিল পরিচালিত...।"[৪]

কী চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা এবং ইতিহাসের ঘটনার ভুল বিশ্লেষণ একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের রবীন্দ্রবিরোধিতায়। রবীন্দ্রনাথ কেন ১৯০৫-র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। কবির সেই অংশগ্রহণে কোন মুসলিম বিদ্বেষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে এক সময় স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এইসব কাহিনী ইনকিলাব গোষ্ঠীর অজানা নয়। ইনকিলাব পাকিস্তানের আদর্শ অনুসরণ করে আবার নিষিদ্ধ করতে চায় রবীন্দ্রনাথকে। পাকিস্তানে রবীন্দ্রবিরোধিতা কখনও রুচিহীন রবীন্দ্রনিন্দায় পরিণত হয়নি। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তাই হচ্ছে। ইনকিলাব রবীন্দ্র সাহিত্যের জাত বিচার করছে টুপী-টিকি আর তসবীহ-পৈতা দিয়ে। তারা বলতে চায়, স্বাধীন থাকতে চাইলে, মুসলিম থাকতে চাইলে রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করা চলবে না।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিবসকে স্মরণ করে ইনকিলাব। ২৫ বৈশাখ এবং ২২ শ্রাবণ ইনকিলাবের একটি পাতা 'নিবেদিত' থাকে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখা কবিতা ও প্রবন্ধের জন্যে। এই বিশেষ দিনের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কবির জীবনকালে কিংবা তাঁর প্রয়াণের পরে যে সব সাহিত্যসমালোচক রবীন্দ্রবিদূষণে ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁদের লেখার পুনর্মুদ্রণ। সাহিত্যের ইতিহাসে যে লেখার স্থান হয়নি তাই খুঁজে নিয়ে নতুন সুর সংযোজন করছে তাতে ইনকিলাব। হারিয়ে যাওয়া সেই সব রবীন্দ্রবিদূষণ কথা আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনকিলাবের ২৫ বৈশাখে আর ২২ শ্রাবণে।

আবুল মনসুর আহমেদের কোন পরিচয় বড়, সাহিত্যিক না রাজনীতিক, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু তার সাহিত্যিক পরিচয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের পক্ষে ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি সেই মত পরিবর্তন করেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে মুসলমান বাঙালির ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার বলে স্বীকার করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আদর্শকে তাঁর কাছে গ্রহণীয় মনে হয়নি সেখানে মুসলিম ঐতিহ্যের কোন প্রতিফলন নেই বলে। 'Our Cultural Heritage' গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

> "Above all, he was the exponent of the concept of Greater India, which he has left symbolized, eptiomized and enshrined in the Visws Bharati, as his life mission ...
> You cannot separate Rabindranath, ... from the missionary of the Visva Bharati..."

আবুল মনসুর আহমদ মনে করতেন হিন্দু সংস্কৃতি এবং মুসলিম সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপেই হিন্দু সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। তাই রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানের, পরবর্তীতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অংশ হতে পারে না।

> "... As there two such distinctive societies two separate and distinctive cultures grew in the two nurseries viz. Bengali Hindu Culture and Bengali Muslim Culture. There was no common culture in Bengal. ..."

যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্য বলে উচ্চারণ করেছিলেন তাঁদের বিপক্ষে আবুল মনসুর আহমদের সাবধানবাণী হল,

> "They went much further and asserted that Tagore was an intergral part of our culture. It was an assertion which was not warranted by history of Bengal, either political, cultural, social or literary."[৫]

এই সাবধানবাণী ইনকিলাবেরও। আবুল মনসুর আহমদের এইসব বক্তব্য জানার জন্যে মূল রচনা পড়ার প্রয়োজন নেই, ইনকিলাবের পাতায় রবীন্দ্রবিরোধিতার পক্ষে বার বার পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমদকে। সংস্কৃতি নির্মাণে ধর্মের স্থান থাকলেও তা প্রধান এবং একমাত্র উপাদান নয়। অনেকগুলি উপাদানের একটি মাত্র তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যে কিংবা রবীন্দ্রমানসে মুসলমানদের জন্যে এতটুকু জায়গা ছিল না বলেই মনে করতেন। 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

> "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর বিশ্বে কতবার শারদীয়া পূজার আনন্দময়ী মা এসেছে কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ-মহরমের চাঁদ ওঠেনি।"[৬]

এই বক্তব্য তথ্য সমর্থিত নয়। রবীন্দ্রবিশ্বের আকাশে ঈদ-মহরমের চাঁদ কম উঠলেও একেবারেই কি ওঠেনি? তিনি হিন্দু মুসলমান সমস্যার কথা বলেছেন। মুসলমান প্রজা এলে হিন্দু জমিদারদের জাজিম তুলে বসাবার কথা বলেছেন এবং ঝড় ও ঝড় পরবর্তীকালের চড়ুইদের মত ঐক্যের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিজয়া সম্মিলনীর (১৩১২ বাংলা) এক ভাষণে আহ্বান জানিয়েছিলেন,

> "... শঙ্খ মুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর।"[৭]

দৈনিক ইনকিলাবে কি কখনো এই বাণী প্রকাশিত হবে? এখানে তো রবীন্দ্রনাথের কাছে পূজার্থী আর নামাজীর সাথে কোন ভেদ দেখি না আমরা। এই রবীন্দ্রনাথকে কি মুসলিম বিদ্বেষী বলব?

ইনকিলাব রবীন্দ্রনাথকে 'কবিগুরু' কিংবা 'বিশ্বকবি' বলতে রাজী নয়। তাদের কাছে তিনি শুধুই একজন 'কবি'। ইনকিলাব মনে করে "সমকাল বিচারে প্রথম কবিগুরু আলাওল, রবীন্দ্রনাথ নন।"[৮]

আলাওলকে অস্বীকার রবীন্দ্রনাথও করেননি। কিন্তু তাঁকে টেনে এনে কি রবীন্দ্রনাথকে ছোট করতে হবে? রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি রূপে স্বীকার করতে চান না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এবনে গোলাম সামাদ। তিনি নিয়মিত লেখেন ইনকিলাবে। তাঁর ভাষায় বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কোন অবদান নেই। নোবেলবিজয়ী এই কবি এই বাংলা ভাষায় কবি। রবীন্দ্রসাহিত্যে নাকি কোন বিশ্ববোধ নেই।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানকে ইনকিলাব বলে রবীন্দ্রপূজা। রবীন্দ্রচর্চা তাদের কাছে রবীন্দ্র উন্মাদনা।

রবীন্দ্রপ্রয়াস দিবসে কবি শামসুর রাহমান শ্রদ্ধা জানান কবিকে,

> "... কার উপস্থিতির আভায় ঘর
> উদ্ভাসিত হলো এবং আমি চোখ কচলে দেখি
> আমার টেবিলে হাত রেখে একটু ঝুঁকে
> দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবমূর্তি।"[৯]

ওবায়দুল হক সরকার মনে করেন, কবি শামসুর রাহমানের আরাধ্য রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেবমূর্তিতে বিশ্বাসী। মূর্তির উচ্ছেদকল্পেই ইসলামের আগমন।[১০] তাই শামসুর রাহমানকে আর মুসলমান বলা যায় না। তিনি পরিণত হয়েছেন মুরতাদে। মুরতাদদের মুসলমানরা কখনো ক্ষমা করেন না। তাই শামসুর রাহমান কবিশ্রেষ্ঠ হলেও ইনকিলাবও তাঁকে ক্ষমা করতে পারে না।

পাকিস্তানী জমানায় পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী বামপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতেন। সেই সমালোচনা সাম্প্রদায়িক কিংবা অসাহিত্যিক ছিল না। রবীন্দ্রনাথের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকত তাঁদের সমালোচনা। তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মবিচার করতেন না আনন্দময়ীর আগমনবার্তা বা ঈদের চাঁদ দিয়ে। বদরুদ্দীন উমর ষাটের দশকে লিখেছিলেন :

> "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য একটি বিচিত্র মহাদেশ। বিষয়বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তির দিক থেকে তার তুলনা নেই। তাঁর হাতে আমাদের সাহিত্য যে ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়েছে তার সঠিক হিসাব নির্ধারণও সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমাদের প্রথম বিশ্বপরিচয়। তাঁর সৃষ্টিকর্মই হলো বহু বিদেশী সভ্যতার সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির যোগসাধনার শ্রেষ্ঠতম ফসল। আমাদের দেশের এক যুগ সন্ধিক্ষণে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বহু বিচিত্র পথ একের পর এক উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং সবকিছুই হয়েছিলো তাঁর অন্তরে মুদ্রিত এবং সাহিত্যে প্রতিফলিত। এজন্যেই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য কী এ আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ। তাঁর বিশাল প্রতিভা, বিপুল অভিজ্ঞতা এবং অপূর্ব রচনা শৈলী তাঁর ঐতিহাসিক

যাত্রাপথে নব নব দিগন্ত রচনা করেছে। তবু রবীন্দ্রযুগকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্র শিল্প সাহিত্যের কোন মূল্যায়নই সম্ভব নয়। সেদিক থেকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মেরই একটা ঐতিহাসিক চরিত্র আছে।"[১১]

বদরুদ্দীন উমরের রবীন্দ্রমূল্যায়নে অস্বচ্ছতা নেই। সামন্তবাদী, বুর্জোয়া কবিকে তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্যের জন্যে অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে। বরুদ্দীন উমরের সাথে লেখক শিবিরে যুক্ত ছিরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী লেখক ডক্টর আহমদ শরীফ। বাংলাদেশে তিনি কেন রবীন্দ্রনাথের চরিত্র হনন করতে গেলেন তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তাঁর রবীন্দ্রনিন্দাকে শুধুই একাডেমিক বলেও আমরা ভাবতে পারিনি।

"রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্রমূল্যায়ন" করতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনিন্দায় মুখর হয়েছিলেন। 'বিশ্বের কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক' রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল তা হল অত্যাচারী প্রজাপীড়ক জমিদার রবীন্দ্রনাথ। সেই জমিদারের কোনো ঐতিহ্য নেই শিলাইদহে, সাজাদপুরে কিংবা পতিসরে 'প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, সেতু নির্মাণে, খাল খননে, বাঁধ তৈরিতে অথবা অনাথাকে কোনোরূপ ভাতাদানে'। 'সামন্ত-জমিদার-বেনে-বুর্জোয়া' ঘরে জন্ম রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিদ্বেষী বলেও নিন্দা করেছেন আহমদ শরীফ।

"উনচল্লিশ বছর বয়সে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এবং বৌদ্ধ, রাজপুত, মারাঠা ও শিখ ইতিবৃত্ত-উপকথা নিয়ে তিনি কথা ও কাহিনী কাব্য রচনা করেন। কিন্তু সাড়ে সাত'শ বছরের পুরোনো দেশজ কিংবা বিদেশাগত দরবেশ বা শাসক মুসলিমের কোন ব্যক্তিগত কৃতি কিংবা গুণ-মান-মাহাত্ম্য তাঁর কাব্য প্রেরণার উৎস হয়নি। এমন কি আকবর বাদশাহ কিংবা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তি, রাজিয়া-আনারকলি-নূরজাহানও নন। ছয়শ' বছর ধরে প্রবল প্রতাপ এমন এক বিদ্যা-ও বিত্তবান জ্ঞান-কৃতি-কীর্তি বহুল জাতির বা সম্প্রদায়ের কিছুই তাঁর (তাজমহলই ব্যতিক্রম) আবেগ উদ্রিক্ত করতে পারেনি, এতে মনে হয় বিদেশাগত এ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অন্তরের গভীরে প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ বা স্থায়ী অশ্রদ্ধা ছিল— অথচ শাসক ইংরেজের প্রতি তাঁর এ বিদ্বেষ দেখা যায় না, বরং বড়ো ইংরেজের প্রতি ছিল তাঁর অপরিমেয় অনুরাগ ও গভীর আস্থা আর নিবিড় শ্রদ্ধা।"[১২]

প্রগতিশীল বামপন্থী বুদ্ধিজীবী আহমদ শরীফ নিজেকে বিতর্কিত করতে ভালবাসতেন। তাঁর উল্লিখিত রবীন্দ্রমূল্যায়ন মাত্র দুই যুগ আগের। বাংলাদেশে এই রবীন্দ্রনিন্দা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু আহমদ শরীফ না চাইলেও তিনি যে অস্ত্র তুলে দিয়ে গেছেন প্রতিক্রিয়াশীল ইনকিলাবের হাতে, সেই অস্ত্র তারা বার বার ব্যবহার করছে। ইনকিলাব সুযোগ পেলেই আহমদ শরীফের রবীন্দ্রনিন্দার উদ্ধৃতি দেয়।

বামপন্থী আহমদ শরীফের সগোত্রীয় কবি ফরহাদ মজহার। সংবাদপত্রে তিনি কলামও লেখেন। ফরহাদ মজহার লিখলেন "ঠাকুরের বেটা',

"আমাদের রবিবাবু মস্তোবড়ো কবি, সাহেবেরা
নোবেল প্রাইজ দিয়ে হক্ তার সাহিত্য কীর্তির
করেছে কদর। ইংরেজের ঘেঁটু হয়ে তার বাপ দাদা

মালপানি কামিয়েছে, ব'নেছে স্বঘোষে জমিদার
কিন্তু বংশের দোষে জল পড়া পাতা নড়া প্রভু
কভু বন্ধ হয় নাই— সে হয়েছে বিশ্বের শায়ের।
তাঁহারে সালাম করি তাঁহারে মারহাবা কহি প্রাণে
পরওয়ারদিগার তবু দিল্ মোর বহুত নাখোশ
তাঁর প্রতি। ছিল দোষ রবীন্দ্রের। তেনার কলমে
বহু পয় পয়গম্বর সাধক ও মনীষীর নাম
হয়েছে স্মরণ কিন্তু ঘৃণাক্ষরে নবী মুহম্মদ
আকারে ইঙ্গিতে ভাবে দিলে কিম্বা নিবের ডগায়
একবারও আসে নাই, তাঁকে তাই মাফ করি নাই।
ঠাকুরের বেটাটারে তুমি কিন্তু রহমান করে দিও মাফ।"[১৩]

'ঠাকুরের বেটা' ফরহাদ মজহারের কাব্যগ্রন্থ 'এবাদতনামা'র ৩১ সংখ্যক কবিতা। প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০। এই কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয় ইনাকিলাবে। রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবসে। ফরহাদ মজহারের কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'শ্রদ্ধা' জানায় ইনকিলাব। এই তথ্য কি অজানা ফরহাদ মজহারের? তাঁরও আদর্শের পালাবদল হচ্ছে। তিনি এখন জেহাদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ইনকিলাব তাঁকে বাহবা দিচ্ছে।

ইনকিলাবী বুদ্ধিজীবীদের হরেক রকম রূপ। যাঁরা পরিশীলিনভাবে রবীন্দ্রনিন্দা করেন, তাঁরা বলেন,

"বাংলাদেশে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সাথে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, স্বপ্ন, কামনা, কল্পনা, রাষ্ট্রচিন্তার কোন মিল নেই, ছিল না। তিনি আমাদের অবহেলায় এড়িয়ে গেছেন।"[১৪]

যে কবি মুসলমানদের অবহেলায় এড়িয়ে গেছেন তাঁকে কেন মহিমান্বিত করতে যাবে ইনকিলাব! তাঁকে তো বর্জন করাই শ্রেয়।

যাঁরা আর একটু পরিশীলিত তাদের রবীন্দ্রবিরোধিতা অন্যরকম। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে চান না। তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে চান বিশ্বসাহিত্যের অংশরূপে। যেমন করে একজন ইংরেজীভাষী আমেরিকান পড়েন শেক্সপীয়রকে। তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিধর্মী, বিজাতীয় কবি। তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করা যায় না। রবীন্দ্রসাহিত্যের সাগরে মুসলমানদের আত্মার কোন প্রতিধ্বনি নেই।[১৫]

এই ধারার আরেক বুদ্ধিজীবী, সঙ্গীতশিল্পী আমলা চূড়ামণি মোহাম্মদ আসাফউদ্দোল্লাহ। তিনি ইনকিলাবে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি। আমি নিজে তাঁকে ভালবাসি। আমি কিন্তু কবি হিসেবের চেয়েও ছোট গল্পকার হিসেবে সবেচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করি। এজন্য আমার দেয়া কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই তাঁর। কিন্তু তিনি তো আমাকে বা আমাদেরকে নিয়ে কিছু লেখেননি। তিনি শিলাইদহে বসে লিখেছেন বলে আমার কবি হয়ে গেলেন? আমার দেশের মাটিতে বসে

দালালরা যা করে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে দেশেপ্রেমের কোন সাইন নেই। তাঁর লেখা নিশ্চয়ই আবৃত্তি হবে তাঁর দেশে। আমার জীবনবোধের সাথে তো কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে আমি একটা পরিষ্কার কথা বলতে চাই। শেক্সপিয়র ইংরেজি সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার। শেক্সপিয়র ডে বলে কোন ডে আমেরিকা সেলিব্রেট করে না। অথচ আমেরিকাও ইংরেজভাষী। একই ভাষা বলে তাদের ন্যাশনাল পোয়েট শেক্সপিয়র নয়। তারা মার্ক টুয়েনকে তাদের জাতীয় মর্যাদা দেবেন। শেক্সপিয়র যত বড় মাপের কবিই হোক না কেন তারা তাদের দেশের কবিকে মর্যাদা দেবেন। সুতরাং আমাদের রবীন্দ্রনাথকে ততটুকু সম্মান করা উচিত যতটুকু আমেরিকা শেক্সপিয়রকে করছে।"[১৬]

আসাফউদ্দোল্লাহ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বিশিষ্ট সদস্য (সি.এস.পি) পাকিস্তানে-বাংলাদেশে আমলা হিসাবে খ্যাতি ছিল তাঁর। এখন অবসরপ্রাপ্ত। সব সরকারের কাছেই তিনি নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে জানতেন। নজরুল সঙ্গীতে দক্ষতা আছে তাঁর। বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী ফিরোজা বেগম তাঁর সহোদরা। তিনি রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে মূল্যায়ন করতে চান না। চান গল্পকার হিসেবে। এই না চাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রবিরোধিতার অন্য রূপ। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বাংলাদেশের কবি হিসেবে স্বীকার করতে চান না। তাহলে নজরুলও তো বাংলাদেশের কবি নন। এই যুক্তি আসাফউদ্দোল্লাহরা বোঝেন। তবুও বুঝতে চাইবেন না। তিনি বাংলাদেশে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনেরও বিরোধী। কেন থাকবে রবীন্দ্রদিবস বলে বিশেষ দিন? এই বিরোধিতার জন্যই ইনকিলাব তাঁদের লালন করে।

বিধর্মী রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের ঐতিহ্য নন। তাঁর উত্তরাধিকারও বাংলাদেশের জন্যে নয়। তবুও তাঁর রচিত গান এখনো বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু এই সঙ্গীত যে মুসলমানদের ধর্মবিরোধী, ইনকিলাব নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে এই সঙ্গীতের। ওবায়দুল হক সরকার মুসলমানদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন,

"ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি
কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো।
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।"

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে দাবি করা হয়েছে মা ক্ষেত সব ফসলে ভরে দিয়েছেন কিন্তু কোরআন পাকে দাবি করা হয়েছে "আর তাহাদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন এই মৃত অনুর্বর ভূমি আমি উহাকে জীবন্ত ও উর্বর করিয়াছি অথবা আমি উহা হইতে শস্য উৎপাদন করিয়াছি ফলে, উহা হইতেই তাহারা খায়।" (আয়াত ৩৩, সুরা ইয়াসীন)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা মা ও বাবা কোনটাই নন। তিনি নারী বা পুরুষের ঊর্দ্ধে। তার কোনো আকার নেই। তিনি সম্পূর্ণ নিরাকার। এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ মানবাধিকার অতীত এক অস্তিত্ব। আল্লাহকে সুখ-দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু

জাতীয় সঙ্গীতে রয়েছে— "মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি।" জাতীয় সঙ্গীতে বলা হয়েছে— 'বটের মূলে নদীর কুলে' তথা গোটা বাংলাদেশ হল মা'র। মুসলমানের বিশ্বাস সার্বভৌমত্ব হল আল্লাহতায়লার। আল্লাহকে অস্বীকার করে মাতৃবন্দনায় রচিত এই জাতীয় সঙ্গীত কবুল করার পর আল্লাহ কি এই জাতির রোযা কবুল করবেন? রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায় বর্ণিত 'ভরা ক্ষেত', 'আঁচল', 'বটের মূলে', 'নদীর কূলে' সবই মার দৈহিক প্রকাশ। বাংলাদেশের আত্মা হলেন মা ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে ... মা সম্বোধন দ্বারা দেশমাতৃকাকে আহ্বান করা হচ্ছে।

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত অংশীস্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না। এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া থাকেন। এবং যে আল্লাহর সহিত অংশীস্থাপন করে, তবে নিশ্চয় সে শুধু বিপথে বিভ্রান্ত হইয়াছে। উহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে নারী প্রতিমাপুঞ্জকেই আহ্বান করে এবং তাহারা শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না।" (আয়াত ১১৬ ও ১১৭ সূরা নেসা)

শুধু মার গুনগান যা আমাদের তথা তৌহিদবাদীদের বিশ্বাস বিরুদ্ধ শেরক। জাতীয় সঙ্গীত আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে পরিণত করেছে। আমাদের শিশুরা বিদ্যালয়ে নিয়মিত সঙ্গীত গাওয়ার ফলে মা'র প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের আল্লাহ-রাসূলের কথা শোনানো হয় না।"[১৭]

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের বিরুদ্ধে এতদিন অভিযোগ ছিল এই সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। এই আন্দোলন ছিল মুসলিম স্বার্থ পরিপন্থী। জামাতে ইসলামীর সাংসদ জাতীয় সঙ্গীতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঈমান আকিদার পরিপন্থী ভাবধারা রয়েছে বললেও সেই অভিযোগের সুর খুব জোরালো ছিল না। 'ইনকিলাব' পবিত্র কোরানের আয়াত বিশ্লেষণ করে প্রসান করার চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত অর্থ ইসলামের মৌল ধ্যান-ধারণার বিরোধী। আর 'ইনকিলাব' এ এই ধরনের স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করছে মুসলমানদের পবিত্র মাস রূপে পালিত রমজান মাসে। ওবায়েদুল হক সরকার প্রশ্ন তুলেছেন রমজান মাসে জাতীয় সঙ্গীত গাইলে মুসলমানদের রোজা পালন জায়েজ হবে কিনা, পবিত্র কোরানের আয়াত তুলে ধরে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতকে এর আগে কেউ বিশ্লেষণ করেননি। 'ইনকিলাব' বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করতে চায়।

শুধু ওবায়দুল হক সরকার নন। জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তনের দাবী তুলছেন অনেকেই। এবনে গোলাম সামাদ বলেন,

"যে কোন গানই একটা দেশের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে। তা তার সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক না কেন।... আজকের বাংলাদেশ মূলত বাংলাভাষী মুসলমানের সংগ্রামের ফল। এর আছে একটা পৃথক ঐতিহ্য। যেটা কেবল রবীন্দ্র সাহিত্যের নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "সোনার বাংলা" গানটিকে গ্রহণ করা হয় আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে। আমার জানা মতে, এই গানটি

আমাদের উপর কার্যত চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে, একটা বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে। ১৯৭২ সালে সব ক্ষেত্রেই ভারতের চাপ ছিল প্রচণ্ড যা অস্বীকার করা সে সময় সম্ভব ছিল না। যে কারণে গানটিকে আমাদের উপর মহল বিশেষের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল সেটা এখন অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।...

... আমরা যা পারি, তা হলো, বিশ্বের কাছে আমাদের পৃথক সত্তার পরিচয়কে বিশেষভাবে তুলে ধরতে। এ কারণে, রবীন্দ্রনাথের, "সোনার বাংলা" গানকে আর জাতীয় সঙ্গীত রাখা উচিত হবে না। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে অন্য কোন গান...। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এই পরিচয় হতে পারে না।"[১৮]

এবনে গোলাম সামাদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সঙ্গীত রূপে চাপিয়ে দিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা— এটা ইতিহাসের বিকৃতি। বিধর্মী কবির রচিত বলেই তিনি জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তন চান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহও তাই চান।

"যে গানটিকে সাময়িকভাবে জাতীয় সংগীত হিসেবে ধারণ করা হল তা এমন এক কবির রচিত যার অপর একটি গান প্রতিবেশী হিন্দু ভারতে জাতীয় সংগীত। যিনি বৃহত্তর ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের মধ্যেই নিজ পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা এক আত্মবিস্মৃত জাতি যে আমাদের দেশীয় কবির রচিত কোন গানের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীত হবার মত উৎকর্ষ খুঁজে পেলাম না অথবা একাত্তরের রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়েও আমাদের কোন কবির পক্ষে সে রকম যোগ্য একটি গান রচনা করা সম্ভব হল না। আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্মাণের এই ব্যর্থতা ক্ষমার যোগ্য নয়।"[১৯]

মাহবুবউল্লাহর কাছে রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলাকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণ হলো সুবিবেচনা ও সুচিন্তা বিবর্জিত উত্তেজনার প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ তার কাছে হিন্দু ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদের কবি। তার রচিত সংগীতকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দান মুসলিম বাংলাদেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের দাবী ইনকিলাবের কাছে ঈমানী দাবী। বিধর্মী কবির রচিত এই সঙ্গীত রচনার পটভূমি ছিল মুসলিম বিদ্বেষ। জন্মভূমিকে মুসলমানরা জননীরূপে ভাবতে পারেন না। তাতে দেশজননীর সাথে আল্লাহর অংশীদারিত্ব ফুটে ওঠে। তাই এই ভাবনাটাই মুসলমানদের জন্যে শেরক। তাই দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা পৌত্তলিকতা সমতুল্য। জাতীয় সঙ্গীতকে এখন এভাবেই ব্যাখ্যা করছে ইনকিলাব। এইসব ব্যাখ্যা অন্তর্হিত হয়ে যেত যদি এই গান রবীন্দ্রনাথের রচিত না হত।

ইনকিলাব রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি বর্জনের কথা বলছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান-আকীদা রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্য তারা পালন করে চলেছে মহৎ কিছু সৃষ্টি করার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ সেই সৃষ্টির পথে বড় বাধা। তাঁকে তো সরে যেতেই হবে।

তথ্যসূত্র :

১. সৈয়দ আলী আহসান, 'পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাসাহিত্যের ধারা' মাহে নাও, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৫১।
২. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৭ মে, ১৯৯৩, উপসম্পাদকীয় 'রূপকার'।
৩. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ৮ মে, ২০০১, 'রবীন্দ্রমানস', অধ্যাপক মতিউর রহমান।
৪. দৈনিক ইনকিবলাব, ঢাকা, ২ অক্টোবর, ১৯৯৯, উপসম্পাদকীয়, হাসানুজ্জামান চৌধুরী; "যদি মুসলিম থাকতে চাই, যদি স্বাধীন থাকতে চাই।"
৫. আবুল মনসুর আহমদ, Our Cultural Heritage.
৬. আবুল মনসুর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— বিজয়া সম্মিলন, রবীন্দ্ররচনাবলী — ৩
৮. দৈনিক ইনকিলাব, ৮ মে ২০০১, এস. এম. লুৎফর রহমান, 'সমকাল বিচারে প্রথম কবিগুরু'।
৯. শামসুর রাহমান, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ৬ আগস্ট, ১৯৯৬।
১০. দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ ডিসেম্বর, ২০০০, ওবায়দুল হক সরকার, 'ঈদের বিস্ময়'।
১১. বদরুদ্দীন উমর, 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' গ্রন্থ— সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা।
১২. আহমদ শরীফ, 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' ত্রৈমাসিক উত্তরাধিকার' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৯৩।
১৩. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ৬ আগস্ট, ২০০০, ফরহাদ মজহার, 'ঠাকুরের বেটা'।
১৪. দৈনিক ইনকিলাব, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০১, উপসম্পাদকীয়।
১৫. দৈনিক ইনকিবলাব, ২৪ এপ্রিল ২০০১, মাহবুবউল্লাহ।
১৬. দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ ডিসেম্বর, ২০০১ মোহাম্মদ আসাফউদ্দোল্লাহ, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জামান সৈয়দী, 'আদিগন্ত'।
১৭. দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৭, ওয়াবদুল হক সরকার 'আমাদের রোযা হবে কি'
১৮. দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ আগস্ট, ১৯৯৯ এবনে গোলাম সামাদ, 'জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তন চাই'।
১৯. দৈনিক ইনকিলাব, ৬ জুন ২০০০, মাহবুব উল্লা আফতাব আহমেদ, 'সরাসরি'।

পর্বান্তর, কলকাতা — রচনাকাল

এপ্রিল, ২০০৮ — মার্চ, ২০০২

লালন বিদূষণ : নতুন রূপে

লালন ফকির শুধু একজনের নাম নয়, একটি প্রতিষ্ঠান, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী একটি সামাজিক আন্দোলন, সেই লালন ফকিরকে আর গ্রহণ করতে রাজী নয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা। তাদের মৌলবাদী কিংবা সাম্প্রদায়িকতাবাদী যাই বলি না কেন তাঁরা লালনকে নিয়ে যেই প্রশ্ন তুলেছেন তাতে বিভ্রান্ত হচ্ছেন ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা। লালনের গানে আছে সুষমা ও নান্দনিকতার অপূর্ব সমন্বয়। তবুও তিনি মুসলমানদের জন্যে বিষতুল্য। তাঁকে পরিত্যাগ না করলে মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করা যাবে না। একদা এ কথাটা বোঝাতে চেয়েছে দৈনিক ইনকিলাব— তাদের শিল্প সংস্কৃতি বিভাগে। আর এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছেন অধ্যাপক আবু জাফর। তিনি ইনকিলাবের নিয়মিত উপসম্পাদকীয়ও লেখেন।

লালনের বড় অপরাধ তিনি ইসলামের আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারের বাইরে ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন। সব ধর্মের বাহ্যিক আচার অনুসন্ধানের বিরুদ্ধতা করেছেন। জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। ধর্মের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে আপত্তি জানিয়েছেন, প্রথাগত জীবন ধারাকে অস্বীকার করেছেন।

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে।।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনি চিনি কি করে?
কেউ মালা কেউ তসবী গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলা
জেতের চিহ্ন রয় কাররে।"

ধর্ম ও জাতিভেদের প্রতি এই যে তীব্র ঘৃণা, শ্লেষ ও বিদ্রোহ তাই লালন-গীতির মূলমন্ত্র। কিন্তু লালনের বক্তব্যকে অনুমোদন করেন না অধ্যাপক আবু জাফর। তিনি মনে করেন লালনের গান ইসলাম বিরোধী। তিনি বলেন—

"আমি বলেছিলাম, লালন নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের কবি এবং বহু মানুষের কাছে একজন আউলিয়া সদৃশ উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক সাধকও বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শির্ক, বিদআত ও গোমরাহির এক চূড়ান্ত নমুনা। তাঁর মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান বাঙ্গালী সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে, যে কোন কারণেই হোক যত মূল্যবান ও মরমিয়া

ধনাঢ্যতার পরিচয়ই বহন করুক, লালন আসলে মুসলমানের আকীদা ও ঈমানবিধ্বংসী এক জঘণ্য মহানায়ক। তাঁর ও তাঁর গানের প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা পোষণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়াবহ অপরাধ। শুধু অপরাধ নয়, লালনের বক্তব্যের সাথে ক্ষীণভাবেও যদি ঐকমত্য পোষণ করা যায়, ঈমানই থাকে না অতএব, বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রতি অনুগত তওহিদবাদী যে কোন মুসলমানের কাছেই যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ"।

লালন বড় মাপের মরমিয়া কবি হতে পারেন তবুও লালন পরিত্যক্ত। এভাবে যদি ইসলাম ধর্মকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে ধর্ম হিসাবে ইসলামের সর্বজনীনতা এবং মানবতাবাদী রূপ বজায় থাকে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। বিষয়টি এতই স্পর্শকাতর যে তা নিয়ে কিছু বলা একজন অমুসলমানের জন্যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে।

অসংখ্য গানে লালন যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে প্রাধান্য পেয়েছে মানবতাবাদ, ধর্মের আনুষ্ঠানিকতাকে দূরে রেখে হৃদয়ের সহজ সত্যের আলোকেই ধর্মকে চিনতে চেয়েছেন লালন। তার কণ্ঠে বারবার শোনা গেছে—

"এমন মানবতায় আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে"
অথবা,
"যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয়
রাম-রহিম করিম-কালা এক আত্মা জগৎময়।"
কিংবা,
"রাম কি রহিম যে কোন জন
মাটি কি পবন জল কি হুতাশন
শুধাইলে আর অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না।"
লালন বলতে পারেন,
"নদী কিংবা বিল-বাওড়-খাল
সর্বতরে একই জল,
একা মোর সাঁই আছে সর্ব ঠাঁই
মানুষে মিশে সে হয় রূপান্তর।"

লালন ধর্মকে যেভাবে দেখেছেন, তাঁর ঈশ্বরকে যেভাবে দেখেছেন তার সাথে নাকি ইসলামের লক্ষ যোজন দূরত্ব। লালনের উদার মানবতাবাদ তাই মূল্যহীন আবু জাফরের কাছে। তিনি পরিত্যাগ করতে বলছেন লালনের গান, এই গানে যতই নান্দনিকতা থাকুক, তাতে অশ্লীলতাই প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে করেন আবু জাফর। লালন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন।

"লালন ফকিরের গান যে শিল্পকর্ম হিসেবে অনবদ্য, এই বিষয়ে তার ঘোরতর কোন শত্রুও দ্বিমত পোষণ করেন না। এবং কোন সন্দেহ নেই, লালনগীতি যে একটি বিশেষ জনপ্রিয় সঙ্গীত ধারা হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তারও মূল কারণ, এই গানের অপরাজেয় সুষমা ও নান্দনিকতা। কিন্তু মুসলমানের কাছে নান্দনিকতা একমাত্র বিচার্য নয়। অশ্লীলতা, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস, বহু দেবতার আরাধনা, নারীদের পাবলিক প্রপার্টিতে

পরিণত হওয়া, যৌনতা, বহুগামিতা,—এসবও নান্দনিকতার মোড়কে পরিপাটিরূপে পেশ করা সম্ভব। কিন্তু বিষ ভর্তি এই নান্দনিকতার পেয়ালা ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। যা মানুষকে আকৃষ্ট করে অশ্লীলতার দিকে, যৌনতার দিকে, ঈমান ও আখেরাতবিধ্বংসী খোদাদ্রোহিতার দিকে, সেই নান্দনিকতার এক পয়সা মূল্য অন্তত ইসলামে নেই। বরং এই ধরনের গর্হিত শিল্পকর্মকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করাই ইসলামের দাবী।"

আবু জাফর মনে করেন "ইসলামের ন্যূনতম দাবীর প্রশ্নেও এই 'মহিমান্বিত মহাকবির' কোন স্থান নেই। শুধু লালন নন, তিনি মনে করেন 'ইসলামের বিরুদ্ধে বাউলও একটি অন্যতম ফিতনা'। এই 'ফতোয়ার ওপর মওলানাদের সার্টিফিকেট তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

অথচ একসময় এই অধ্যাপক লালনের প্রতি আসক্ত ছিলেন। এখন সেই আসক্তির জন্যে তিনি তওবা করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন সেই প্রলয় থেকে।

"যারা লালনের প্রতি আমাকে আমার পূর্বপ্রণয় ও ভূমিকার কারণে ভর্ৎসনা করেন, আমি তাদেরকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই! এই তিরস্কার আমার প্রাপ্য। তবে যেহেতু, অনেক বিলম্বে হলেও লালনের অশ্লীলতা ও পাপপরিকীর্ণ গানের 'মহত্ত্ব' থেকে আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়েছি, এ জন্য ঈষৎ সাধুবাদও আমার প্রাপ্য। আসলে এ রকমও ঘটে। মক্কার যে কাফেররা একদা নানা দেবদেবীকে আন্তরিক শ্রদ্ধায় যুগ যুগ ধরে অর্ঘ্য নিবেদন করত, তারাই স্বহস্তে সে সব 'আদরণীয়' দেব-দেবীকে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সত্যের সংস্পর্শে আসা মাত্র আমারও বহুদিনের অন্ধকার জীবন থেকে লালনপ্রীতি বিদূরিত হয়েছে; বিলম্বে হলেও এ জন্য আমি নিজেকে আল্লাহর অনুগ্রহ ভাজন বলে অনুভব করি। আর এটাই তো চূড়ান্ত সত্য, 'আল হাকু ওয়া জাহাকাল বাতিল, ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা'। সত্যের আগমনে বাতিলের বিলুপ্তি ঘটেছে, নিশ্চয়ই বাতিলের বিলুপ্ত হওয়ারই কথা (সূরা বনি ইসলাইল)। অতএব লালনকে অন্য কারও মাথা থেকে নামানো যাক না-যাক, আমি যে এই বাতিল প্রহেলিকা থেকে উদ্ধার পেয়েছি, এটা আল্লাহর রহমত।"

অধ্যাপক আবু জাফরের পত্নী বাংলাদেশের প্রখ্যাত লালন সঙ্গীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। তাঁকে এখনও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে লালনগীতি পরিবেশন করতে দেখা যায়। আবু জাফরের সাথে তাঁর সম্পর্ক কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদের তাতে কৌতূহল নেই। আবু জাফর নিজে মুক্তি পেলেও তার পত্নীর মুক্তি বোধ হয় এখনও হয়নি।

লালনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়েই যত আক্রোশ আবু জাফরদের। তাঁর গানে রয়েছে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের ঐতিহ্যের প্রতিফলন। সমকালেও তাঁকে প্রবল বিরোধিতার সাথে সংগ্রাম করে এগোতে হয়েছিল। শাস্ত্রাচারী হিন্দুরা তাঁকে গ্রহণ করেননি। শরিয়তপন্থী মুসলমানরা তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। মোল্লাদের ফতোয়া আর পণ্ডিতদের বিধান প্রতিহত করতে পারেনি লালনকে। লালনের গানের বাণীকে বুঝবার এবং তাঁকে গ্রহণ করবার মানসিকতা এবং শিক্ষা যাঁদের তখন ছিলনা, শতবর্ষ অতিক্রম করে আবার তাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন বাংলাদেশে। তাঁদের কাছে লালন 'এক দেহবাদী অশ্লীল বাউল'। "এদের কাজই হল মুসলমানদের জিহাদী প্রেরণাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা এবং যথাসম্ভব ইসলামের মৌলবাদী ও আকীদাকে বিনষ্ট করে খুব চাতুর্যের সাথে মুসলমানকে এক ক্লীব ভীরু প্রায় নপুংসক মুশরিকে পরিণত করা।"

এই লালনকে বর্জন করাই তো ইসলামের উপযুক্ত কাজ। লালনের গান বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্যে নয়। এখনও এই ফতোয়া জারী হয়নি। কিন্তু আবু জাফররা সেটাই চাইছেন।

লালন একটা গানে বলেছেন,

"আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখনারে মন ভেবে।
দেশ-বিদেশে দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁফিয়ে।"

আবু জাফর এই গানকে ব্যাখ্যা করেছেন বিকৃতভাবে। তিনি এই গানের মধ্যে 'অনেকখানি যৌনতার গন্ধ' খুঁজে পেয়েছেন। এই গানের মর্মকথাই তো হল আত্মোপলব্ধি এবং মানবতার জয়গান। লালন তো ধর্মপ্রথা আনুগত্যকে গ্রহণ করেননি। তিনি তো মুক্ত কণ্ঠেই বলেছেন—

"না হ'লে মন সরলা কি ফল মেলে কোথা ধূড়ে।
হাতে হাতে বেড়াই মিছে তওবা পড়ে।।
মক্কা-মদীনা যাবি ধাক্কা খাবি
মন না মুড়ে।
হাজী নাম বাড়ান লভ্য
তাই দেখিরে।।
মুখে যে পড়ে কালাম তারি সুনাম
হুজুরী বাড়ে।
মন খাঁটি নয় বাঁধলে কি হয়
মনে কুঁড়ে।
মন যার হয়েছে খাঁটি
মুখে যদি গলত পড়ে।
খোদা তারে নারাজ নয়নে,
লালন ভেড়ে।"

লালন চর্চা নিয়ে আমাদের পাণ্ডিত্য নেই আবু জাফরের মত। লালন যখন বলেন,

"পড়বা নামাজ জেনেশুনে"

আবু জাফর তাকে ব্যাখ্যা করেন "নামাজ থেকে মুসলমানকে দূরে রাখার অপূর্ণ ইবলিসী কৌশল" বলে। এই গানের মর্মবাণী যে আবু জাফর বুঝেননা তা আমরা মনে করিনা। ইসলাম কী এতটাই যান্ত্রিক ধর্ম যে শুধু কিছু আচার দিয়েই তাকে বুঝতে হবে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধহয় আমাদের জন্যে অপরাধ।

রবীন্দ্রনাথ লালনের ভাব দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। লালনের গানের বাণী তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি লালনের গান নিয়ে বার বার আলোচনা করেছেন। আমরা দেখতে পাই, ১৯২৫ এ নিখিল ভারত দর্শন মহাসম্মেলনে ১৯৩০-এ লন্ডনে প্রদত্ত 'হিবার্ট বক্তৃতামালায়' ১৯৩৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'কমলা বক্তৃতামালায়' রবীন্দ্রনাথ লালনকে তুলে ধরেছেন বিশ্বের দরবারে। লালনের গানের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের ধর্ম (Religion of Man)। লালনের—

"খাচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়"

গানটিকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন শেলীর বিখ্যাত To Skylark কবিতাটির সঙ্গে তারপরও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "Only Shelley's utterence is for the cultural few, while the Bowl song is for tillers of the soil"

লালনের এই মূল্যায়ন আবু জাফররা অনুমোদন করেন না। তাঁদের কাছে মানুষের একমাত্র ধর্ম আল্লাহ মনোনীত ইসলাম এবং তার সবরকম আচার নিখুঁত এবং নিশর্তভাবে পালন। তার বাইরে 'মানুষের মন' বলে কিছু নেই। যারা আবু জাফরদের মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন, তারা বিধর্মী কাফের না হয় মুরতাদ পথভ্রষ্ট গাদ্দার।

লালনের গানে আছে উদার মানবতাবাদ। তিনি গানের মাধ্যমে যা বলেছেন তাতে কোরান-বেদ এক হয়ে যায়নি। কিন্তু তিনি যা চেয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারিনি, লালনের ব্যাকুল প্রশ্ন ছিল।

> "বেদ-পুরাণে করেছে জারী
> যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
> আমি তা বুঝতে নারি
> দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ।"

এই প্রশ্নের উত্তর যে বড় কঠিন। লালনের কাল (১৭৭৪-১৮৯০ খৃঃ) মাঝখানে চলে গেছে এক শতাব্দী। লালনের গানে রয়েছে অটল ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্যানধারণা। কিন্তু আবু জাফররা মনে করেন ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ হল ধর্মহীনতা। লালন তাঁদের কাছে ধর্মহীন এক মানুষ। অশ্লীলতাই তাঁর প্রিয়তম উপজীব্য। ধূর্ত আধ্যাত্মিকতার আড়ালে অবৈধ দেহসম্ভোগই ছিল তাঁর গানের বাণীর ভিতরের কথা। লালনের খাঁচার ভিতরের অচিন পাখিকে খুঁকে বের করেছেন আবু জাফররা।

বাংলাদেশে লালনগীতি বর্জন করার ডাক এখনও দেওয়া হয়নি। অধ্যাপক আবু জাফরদের হাত ধরে ইনকিলাব সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে মনে হয়। যেদিন সেই ডাক আসবে যেদিন কী বাঙালি মুসলমানদের জন্যে মহতী বিনষ্টি না সমূহ সর্বনাশের দিন হবে সেই বিচারের ভার আমাদের হাতে নেই।

তথ্যসূত্র :

১। আবু জাফর 'লালন : একটি গুরুতর প্রসঙ্গ এবং আরো কথা', দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

২। প্রাগুক্ত।

৩। প্রাগুক্ত।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— Religion of Man

৫। আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদনায় (লালন স্মারক গ্রন্থ) এই প্রবন্ধের তথ্য এবং লালনের গানের উদ্বৃতি নেওয়া হয়েছে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে।)

সময়, ঢাকা
জুন, ২০০৮

(রচনাকাল
মার্চ, ২০০২)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশে নতুন পরিচয়

কবি নজরুল ইসলামের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে, ২৪শে মে ১৮৯৯ (বাংলা ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬)। কবি জীবনের কিছু সময়মাত্র পুর্ব বাংলায় কাটিয়েছেন। তিনি সর্ব অর্থেই এপার বাংলার সন্তান। তাঁর সেই পরিচয়টাই মুখ্য। ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের জন্ম। পূর্ব বাংলা নাম পাল্টে হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। কবি কোন দিনও পূর্ব পাকিস্তানে চরণ রাখেননি। অসুস্থ বাকশক্তি রহিত কবিকে পাকিস্তান সরকার আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাদের বোঝা বাড়াতে চাননি। বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন দেশ হিসেবে মুক্তি অর্জন করে ১৯৭১-এ। তার পরপর স্বাধীন বাংলাদেশের জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে ঢাকায় নিয়ে যান। তাঁকে বাংলাদেশের সাম্মানিক নাগরিকত্বও প্রদান করা হয়। তাঁকে আর কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের দায় এড়িয়ে গেছেন। ঢাকাতেই কবির মৃত্যু। তাঁর প্রয়াণের পর কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ও প্রয়াত পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের পত্নী কল্যাণী কাজী ঢাকায় ছুটে গিয়েছিলেন কবির মরদেহ চুরুলিয়ায় এনে প্রমীলা নজরুলের কবরের পাশে সমাহিত করার জন্য। কারণ সেটাই ছিল কবিপত্নীর অন্তিম ইচ্ছা। কিন্তু কবির আত্মজ ঢাকায় পৌঁছোনোর আগেই কবির মরদেহ দাফন করা হয় তদানীন্তন সামরিক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্দেশে। কবিপুত্র এবং পুত্রবধূর জন্যে অপেক্ষা করার সৌজন্যটুকুও তারা প্রদর্শন করেননি। এইভাবেই নজরুলকে আত্মীকরণ করেন বাংলাদেশ সরকার। এপার বাংলার নজরুল এখন ওপার বাংলার জাতীয় কবি।

কবি নজরুল ইসলামের মৃত্যু ১৯৭৬-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর। 'বাংলাদেশী জাতি'র জন্মদিন বলা হচ্ছে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টকে। কবির মৃত্যু এবং বাংলাদেশী জাতির জন্মের মধ্যে আমরা কোন আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে দেখছি না। মৃত্যুর মধ্যে নয়, কবির জন্মের মধ্যেই নাকি লুকিয়েছিল বাংলাদেশী জাতির জন্ম-সম্ভাবনা। নজরুল ইসলামই নাকি বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বার রূপকার। কেন নজরুল ইসলামকে প্রয়োজন হল? কবিকে পাকিস্তানিদেরও প্রয়োজন হয়েছিল। তবে পূর্ণ নজরুলকে নয়। খণ্ডিত নজরুলকে, বাংলাদেশে সেই খণ্ডিত নজরুলকেই পুনর্জীবন দিয়ে তাঁকে জাতীয় কবিরূপে বরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় নজরুলের জন্ম নয়, তাঁর কর্মভূমিও ছিল না এই ভূখণ্ড, আমন্ত্রিত হয়েই তিনি এখানে এসেছেন, কবিতা-গানও রচনা করেছেন কিছু বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বসে। কোন দাবিতে তাঁকে বাংলাদেশের ভূগোলে টেনে আনা হল, সেটা বুঝতে খুব বেশি

অসুবিধা হয় না। নজরুলকে বলা হয় বিদ্রোহী কবি, পাকিস্তানে তাঁকে নিয়ে যে মাতামাতি হয়েছিল তা কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী সত্ত্বা নিয়ে নয়, তাঁকে বদলে দিয়ে 'মওলানা নজরুল' করে দেওয়া হয়েছিল। নজরুলকে দাঁড় করানো হয়েছিল হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষরূপে। পূর্ব পাকিস্তানের তখন প্রয়োজন হয়েছিল একজন বড়মাপের মুসলমান কবির, যাঁর কবিতায়-গানে-উপন্যাসে-গল্পে-নাটকে মুসলমানদের কথা রয়েছে। নজরুল সাহিত্যে সেই উপকরণ ছিল। অন্য উপকরণও ছিল। নজরুল শুধু মুসলমানদের কথা লেখেননি। সবার কথা লিখেছেন। সেইসব বাদ দেওয়া হয়েছিল। নজরুলকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল পাকিস্তানে। কিভাবে নজরুল পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়েছিলেন সেই ইতিহাস আমাদের জানা আছে। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে বদরুদ্দীন উমর লিখেছিলেন 'নজরুল ইসলাম অহিফেন'। অহিফেন সেবন মানুষের সুস্থ চেতনাকে আক্রান্ত করে। পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল সাহিত্যে সেই অহিফেন আবিষ্কার করা হয়েছিল। তারা রবীন্দ্র বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু নজরুলকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন ছাঁটাই করে, পরিশুদ্ধ করে। নজরুলের শিশুতোষ কবিতার 'ভগবান' পরিশুদ্ধ হয়ে 'রহমান' হয়ে গিয়েছিল। নবীনদের জন্যে লেখা কবিতায় 'মহাশ্মশান' রূপান্তরিত হয়েছিল 'গোরস্থানে'। নজরুলের কবিতার-গানের অনেক শব্দই বদলাতে হয়েছিল, বাদ দিতে হয়েছিল অনেক পংক্তি। নজরুলের এই বাছাই এবং ছাঁটাইকরণকে তারা সাহিত্যিক purging বলেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের ভাষায় এই purging-এর উদ্দেশ্য হল, "নজরুলের যে কবিতায় শেরক ও কুফর কালাম আছে তা বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংসের মুখ থেকে নিজেদের রক্ষা করা।"[১]

পাকিস্তানি ঈমান তখন যেভাবে নজরুল সাহিত্যে আরোপিত হয়েছিল, নজরুল সুস্থ থাকলে তা হতে পারত না। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের যা গলাধঃকরণ করানো হয়েছিল মুসলমানরা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তা উগরে দিয়েছিল। কিন্তু আবার তাদের সেই অহিফেন সেবন করতে হচ্ছে বাংলাদেশি হওয়ার পর।

নজরুল ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্ব কখনও মেনে নেননি। ১৯৪০ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিল 'লাহোর প্রস্তাব'। নামান্তরে যা হয় 'পাকিস্তান প্রস্তাব'। লাহোরে জিন্নাহর সেই বিখ্যাত উক্তি :

> "We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definitions..."
> "The Muslims are a nation according to any definition of a nation and they must have their homelands, their terrotory and their state..."

ধর্ম দিয়ে জাতি সৃষ্টি করা যায় না, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে মুসলমানরা। তারা এক 'nation' নয়। জিন্নাহর যুক্তি মেনে নেননি নজরুল কখনও। পাকিস্তান প্রস্তাবকে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন 'ফাঁকিস্তান' বলে। তিনি লিখেছিলেন 'বাঙালীর বাংলা',

"বাঙালীকে বাঙালীর ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

> এই পবিত্র বাংলাদেশ
> বাঙালীর আমাদের

> বাংলা বাঙালীর হোক, বাংলার জয় হোক
> বাঙালীর জয় হোক।"

(নবযুগ, ৩ বৈশাখ, ১৩৪৯)[২]

১৯৪২-এর জুলাইতে নজরুল মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বাকরুদ্ধ। তারপরেও অনেককাল বেঁচেছিলেন কবি। সেই বাঁচা কোনভাবেই বাঁচা নয়। চিরবিদ্রোহীর মৃত্যু ১৯৪২-এই। তাঁর বাকী জীবন মরণেরই অংশ। যাঁরা একদিন নজরুলকে খোদাদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, ইসলামের শত্রু, শয়তান নমরুদ এবং ফেরাউন বলে তিরস্কার করেছিলেন, পাকিস্তান জন্ম লাভ করার পর তার নিশান বরদারদের কাছে তিনি বরিত হলেন পাকিস্তানের আংশিক জাতীয় কবিরূপে। পূর্ণ জাতীয় কবির মর্যাদা ছিল ইকবালের। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজাদ' ১৯৪৯-এ 'নজরুল জন্মদিবস' শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখল "... তিনিই যে প্রকৃতপক্ষে বাংলার প্রথম পাকিস্তানী কবি, একথাও স্বীকার করিতে হয়। এছলামী ভাব ও আদর্শের যে সুষ্ঠু রূপায়ণ তাঁহার কাব্যে দেখি..."[৩]

ফাঁকিস্তানের কবির গায়ে পাকিস্তানি লেবেল এঁটে দিল 'আজাদ', নজরুল কাব্যে 'এছলামী ভাব ও আদর্শের' রূপায়ণ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল আজাদগোষ্ঠী—আসল কথা তা নয়। মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম তাই মনে করেন। নজরুল তো বাঙালি মুসলমানকে বিশুদ্ধ বাঙালি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। শুধু মুসলমান থাকতে বলেননি পাকিস্তানি হয়ে। তাঁর কোনও আলাদা মুসলিম চেতনা ছিল না। তাঁর সমগ্র সাহিত্য, তাঁর সঙ্গীত, তাঁর জীবনধারা তাই বলে।

১৯২৯-এ কলকাতায় জাতির পক্ষ থেকে কবি-সম্বর্ধনা দেওয়া হয় নজরুলকে, সেই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন,—

> "আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তাঁর গান গাইব।"

সব রণাঙ্গনেই সৈনিকরা নজরুলের গান গেয়ে উদ্দীপিত হয়েছে। সেই সৈনিকরা নজরুলের ধর্ম বিচার করেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজের রণাঙ্গনেও সৈনিকদের কণ্ঠে ছিল নজরুলের গান। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীর সেনানীদের কণ্ঠেও ছিল সেই গান।

সেই কবি সম্বর্ধনায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি বলেছিলেন সভাপতির ভাষণে,—

> "নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাংলার কবি, বাঙালির কবি।...আমার বিশ্বাস নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতিমানুষে পরিণত হইবে।..."

তারও আগে বিদ্রোহের 'উল্কানীমূলক' কবিতা লেখার অপরাধে নজরুলের শাস্তি হয়েছিল। কারাবরণকালে নজরুল আমরণ অনশন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে অনশনভঙ্গ করার জন্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। 'শ্রীমান কবি জাকী নজরুল ইসলামকে' উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা। রাজবন্দি নজরুলের কারামুক্তির দাবিতে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে হয়েছিল জনসভানুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাম।[৪]

রবীন্দ্রানাথ-চিত্তরঞ্জন-প্রফুল্ল রায়-সুভাষচন্দ্র এঁদের নজরুল সংযোগ তো এখন ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয় সযতনে। পাকিস্তানি জজবা এখন নাম বদলে রূপান্তরিত বাংলাদেশ জজবায়।

নজরুল এখন আর শুদ্ধ বাঙালি কবি নন, তিনি শুধু মুসলমান কবি। বাংলাদেশি চেতনার ধারক। বাংলাদেশি জাতিসত্ত্বার রূপকার। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'স্বনামধন্য' চরম মৌলবাদী পত্রিকা দৈনিক 'ইনকিলাব' সে তত্ত্বই বোঝাতে চায় বাংলাদেশি জাতিকে।

"নজরুল ইসলাম না জন্মালে আধুনিক বাঙালি মুসলমান জাতির জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বাংলাদেশ এবং কাজী নজরুল ইসলামের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে। এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে দু'জনেরই অপমৃত্যু ঘটবে। নজরুল আমাদের জাতিসত্ত্বার রূপকার, তার প্রাণপ্রবাহ। নজরুল আমাদের জীবনের একদিনের বাদশাহ নন। নিত্যদিন, প্রতিদিন জুড়ে তাঁর আনাগোনা, তাঁর প্রকাশ। আমাদের চিন্তায়, চেতনায়, কথনে, বলনে, শিকক্ষায়, সংস্কারে, জিহ্বায়, কলমের কালিতে জড়িয়ে আছে তাঁর সৃষ্টি, তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিন্তা। সেই স্বাতন্ত্র্য চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, ফুল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে শুকিয়ে যায়, আমরাও বৃন্তচ্যুত হব, হারিয়ে যাব। নজরুলকে জানার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাঙালি মুসলমানের প্রাণের জীবনকাঠি। নজরুলকে জানতে পারলেই বাঙালি মুসলমানের অন্তরের খবর জানা যাবে, বাংলাদেশের মানুষকে জানা যাবে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'উপনিষদের সন্তান'। তিনি বাঙালিকে নিয়ে যাচ্ছিলে 'বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদে'র দিকে। এতদিন 'মুসলমানরা বেঁচে ছিলেন জীবন্মৃত হয়ে, হিন্দুত্ববাদের কাছে শ্বাসপ্রশ্বাস ধার করে কোনও মতে।' নজরুল এলেন মুসলমানদের পথ দেখাতে। তিনি অনুভব করলেন এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন,

"কোথা সে আজাদ, কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান।"

নজরুল কেন এই 'হুংকার' দিয়েছিলেন সে বিশ্লেষণ 'ইনকিলাব'-এর জন্যে নয়। পাকিস্তানি আদর্শে সেই একই কায়দায় 'ইনকিলাব' দিনের পর দিন নজরুলের খণ্ডিত মুসলমানি সত্ত্বার পুনর্জীবন দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা তাদের কাছে 'মিশন'। দৈনিক 'ইনকিলাব'-এর শিল্প-সংস্কৃতি বিভাগে আরিফুল হক, আবু হাসান ওবায়দুল হক সরকার সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। মুসলমানদের তামুদ্দনিক স্বাতন্ত্র্য আবার তাঁরা ফিরিয়ে আনতে চান। বাংলাদেশিদের কাছে নজরুল শুধু তৌহিদবাদের দার্শনিক কবি। তাঁর অন্য পরিচয় নেই। আবার প্রয়োগ করা হচেচ্ছ 'নজরুল ইসলাম অহিফোন'। নতুন প্রয়োজনের তাগিদে একই অহিফেনের নব সংস্করণ।

নজরুল ইসলামের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাসকে অবলম্বন করে সাহিত্য এবং সঙ্গীত সৃষ্টি করলেও অবিভক্ত বাংলার 'মুসলমানরা কোনদিনই তাঁকে ইসলামের খাদেম অথবা মুসলিম সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হিসাবে স্বীকার করেননি' তাঁর কালে। অথচ 'ইনকিলাবি' ভাষায় নজরুলকে এখন বন্দনা করা হচ্ছে,

"বন্যা যেমন পলিমাটি বহন করে এনে নদীর দুই কূলকে উর্বর করে তোলে, নজরুল তেমনি উর্বর করে তুলেছিল মুসলিম মানষকে। নজরুল যেমন অতি স্বাচ্ছন্দ্যেই ভাষাতে সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য সস্থাপন করলেন তেমনি মুসলমানদের মনে সৃষ্টি করলেন আত্মবিশ্বাস।..."[৬]

নজরুলকে বলা হচ্ছে মুসলিম সাহিত্যের অগ্রপথিক। ইসলামি সঙ্গীতের পুনর্নির্মাণে শ্রেষ্ঠ গীতিকার নজরুল সাহিত্যের সাগরে আমরা যেতে চাই না। তাঁর সঙ্গীতের বাণীর একটা তুলনামূলক চিত্র শুধু তুলে ধরতে চাই। রবীন্দ্রনাথের গানের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ তা শুধু 'উপনিষদের আনন্দ' আর 'বৈষ্ণব সাধনার দেহাশ্রয়ী লীলাবাদ' দিয়ে পরিপূর্ণ। মুসলিম সংস্কৃতি তাই রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু নজরুল সঙ্গীতেরও তো বিপুল অংশ গ্রহণ করা যায় না তাহলে, সেই ব্যাপারে বাংলাদেশি মুসলমানরা কতটুকু সচেতন?

নজরুল যেমন সঙ্গীতে উচ্চারণ করেছিলেন,

"আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাঁহার জীবনে মৃত্যুজ্ঞান।"

অথবা,

"(আমি) আল্লাহ নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফলব ফসল বেচব তারে কেয়ামতের হাটে।"

কিংবা,

"আল্লাহ নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়
মোহাম্মদের নাম হবে মোর
(ও ভাই) নদীপথে পুবাল বায়।"

তেমনি হিন্দু ধর্মসংস্কৃতি অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন বিপুল গান। শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, ভজন, পদাবলী, আগমনী, রামপ্রসাদী, অবতার বন্দনা। হিন্দু-সমাজ-সংস্কৃতির এমন কোন শাখা নেই যা নজরুল স্পর্শ করেন নি। নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত রামপ্রসাদকেও ছাড়িয়ে গেছে।

"শ্মশানে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সন্তানে
নিতে কোলে
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ঐ চিতার আগুন
ঢেকে স্নেহ-আঁচলে।"

"শ্মশান কালির রূপ দেখে যা, মুন্ডমালা দুলছে গলে
যে চরণে পদ্ম ফোটে, সেই পায়ে আজ দানব দলে।

হাতে রাঙা খড়্গ দেখে
লুকিয়ে পালায় ভয় পেয়ে কে?
ভক্ত প্রাণের রক্ত জবা দেখ্ না চেয়ে চরণতলে।"
"আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।"
"তুই লুকোবি মা কোথায় কালি
আমার বিশ্বভুবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ডুবালি।"

নজরুলের একটি শ্যামা সঙ্গীত সম্বন্ধে বিখ্যাত সুরস্রষ্টা কমল দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন ('শ্মশানে জাগিছে শ্যামা'),

> "কবির শ্যামা সঙ্গীতের সঙ্গে শ্মশানকালীর এই রূপ আর কোথাও নেই। শ্যামা সঙ্গীতের জগতে এই গানটির আর জোড়া নেই এবং হবে কিনা তাও বলা কঠিন।"[৭]

সুরকার কমল দাশগুপ্তের খ্যাতি সঙ্গীতের বিশ্বে কখনও ম্লান হবে না। তাঁর শেষজীবন কেটেছে বাংলাদেশে, অনাদৃত অবস্থায়, অবহেলায়। বিখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফিরোজা বেগম তাঁর পত্নী। বাংলাদেশ কমল দাশগুপ্তকে বরণ করেনি, মনেও রাখবে না। এত যে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করলেন, সুর দিলেন নজরুল, তার জন্যে তিনি কি কালীভক্ত হিন্দু সাধক হয়ে গিয়েছিলেন? হিন্দুরা কোনদিন নজরুল চরিত্রের সে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেননি।

শুধু শ্যামা সঙ্গীত কেন অন্য যে কোনও পর্যায়ের গানের বাণীও উল্লেখ করার মত,

কৃষ্ণকীর্তন— "এল নন্দের নন্দন নব ঘনশ্যাম
এল যশোদা-নয়নমণি-নয়নাভিরাম..."
"মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে
নওল কিশোর মদনমোহন
চারু ত্রিভঙ্গিম ঠাম বঙ্কিম
বন্দে পদকোটি চন্দ্র তপন।"
শিবস্তোত্র— "হর হর শঙ্কর
জয় শিবশঙ্কর
দানব সন্ত্রাস, জয় প্রলয়ঙ্কর।"
রামবন্দনা— "মন জপ নাম শ্রীরঘুপতিরাম
নব-দুর্বাদল শ্যাম নয়নাভিরাম।"
শিবরঞ্জনী— "জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী
শিব জটা হতে সুরধুনী স্রোতে
ধরি শত শত-ধারে ভাসাও অবনী।"

গঙ্গাস্তব— 'জয় বিগলিত করুণারুপিনী গঙ্গে
জয় কলুষ হারিণী পতিত পাবনী
নিত্যা পবিত্র যোগী ঋষি অঙ্গে।"
বাণী বন্দনা— "নমস্তে বীণাপুস্তক হস্তে দেবী বীণাপানি
শতদলবাসিনী সিদ্ধি বিধায়িনী সরস্বতী বেদবাণী।"
লক্ষ্মী বন্দনা— "লক্ষ্মী মাগো নারায়ণী আয় এ আঙিনাতে
সুধার পাত্র সোনার ঝাঁপি লয়ে হাতে।"

আবদুল আজিজ সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'অখন্ড নজরুলগীতি' সংকলনে মুদ্রিত গানের সংখ্যা ২২৬০। তার মধ্যে ইসলামি সঙ্গীত রয়েছে ১৯৫। আর ভক্তিগীতির সংখ্যা ৫৫৪ (পরিশিষ্ট সহ)। ইসলামি সঙ্গীতে স্থান দেওয়া হয়েছে হামদ, নাত, মর্সিয়া, মুনাজাত, পর্বসঙ্গীত, মুর্শেদী ও দেহতত্ত্বমূলক গান। আর ভক্তিগীতিতে সংকলিত হয়েছে শ্যামা সঙ্গীত, রামপ্রসাদী, আগমনী, পদাবলী, কীর্তন, ভজন, বাউলগান, দেবী বন্দনা, অবতার বন্দনা ইত্যাদি হিন্দু ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি অবলম্বনে রচিত বিভিন্ন ভাবেরও সুরের গান। নজরুল কখনও শ্যামা-সাধক, কখনও বা শ্যামা-পূজারী। কখনও হাতে শ্যামের বাঁশরী কখনও বা শ্যামার খড়্গ। নজরুলের ইসলামি সঙ্গীত যদি মুসলিম মানসকে উর্বর করে তুলে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যকে উজ্জ্বলতর করে তোলে তাহলে তাঁর হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি অবলম্বনে রচিত গান কী সমকালের হিন্দু মানসকেও ধারণ করেছিল?

বদরুদ্দীন উমর মনে করেন,

> "তাঁর লেখনি সৃষ্টি করেছে এক ধর্ম সাহিত্য— যে সাহিত্যের হিন্দু মুসলমান নেই, যা হিন্দুর যতখানি মুসলমানেরও ঠিক ততখানি। এদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে যে নজরুল ইসলামই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি বাঙালি সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাথে তাঁর প্রতিভার তারতম্য থাকলেও এ বিষয়ে নজরুল ইসলাম অতুলনীয়, অনন্যসাধারণ। বাঙালী হিসাবে তাই তাঁর ধর্ম ছিলো না, থাকলে তিনি অতখানি পুরোপুরিভাবে বাঙালি হতে সক্ষম হতেন না। তবু কেউ যদি জোর করে কোন ধর্ম তাঁর ঘাড়ে চাপাতে চায়, তাহলে বলতে হবে যে আসলে তিনি দ্বিধর্মী— তিনি হিন্দু-মুসলমান। অর্থাৎ তিনি শুধু হিন্দু অথবা শুধু মুসলমান নন—তাঁর মধ্যে এ দুইয়ের অবাধ সমন্বয়। এই সমন্বয়ের মধ্যেই নজরুলের বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যেই তাঁর বাঙালিত্বের সম্পূর্ণতা। এ জন্যেই তিনি অবিভাজ্য।
> নজরুল ইসলামের সাহিত্যকীর্তির সাথে যাঁরা পরিচিত তাঁদের অজানা নেই যে তিনি একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি অন্যদিকে তেমনি ইসলামি সাহিত্যেরও প্রতিনিধি। অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় সাহিত্যের যৌথ ধারা তাঁর মধ্যে প্রবাহিত। এ ধারার কোন একটি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা নজরুল ইসলামকে, তাঁর স্বকীয়তাকে অস্বীকার করারই প্রচেষ্টা। তাঁর শ্যামা সঙ্গীতের কথা স্মরণ করে কেউ তাঁকে হিন্দু আখ্যা দিলে তিনি যেমন ভুল করবেন তেমনি তাঁর নাত্ ও হাম্দের কথা স্মরণ করে কেউ তাঁকে মুসলমান আখ্যা দিলেও সেই একই ভুল করা হবে।

নজরুল ইসলামের এই দ্বিধর্মীতার যথার্থ চরিত্র উপলব্ধি করতে হলে ধর্মপ্রেরণার মধ্যে তার সন্ধান করলে চলবে না। তার সন্ধান করতে হবে জনসাধারণের সাথে তাঁর একাত্মতা এবং যোগ সাধনার মধ্যে। তাঁর জীবনী এবং রচনাসমূহের সতর্ক পর্যালোচনা করলে তাই দেখা যাবে যে ধার্মিকতা বলতে চলতি অর্থে যা বোঝায় তার সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই কখনো থাকে নি। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের বিভিন্ন দিক ও বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছিলেন কারণ এই ধর্মসহিত্যের মাধ্যমেই তিনি যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন গণচেতনার, এর মাধ্যমেই তিনি অনেক সময় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন অত্যাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। তাঁর সমস্ত ধর্মবিষয়ক লেখা সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য না হলেও মোটামুটিভাবে তা সত্য।"[৮]

এপার বাংলার বিশিষ্ট লেখক গোপাল হালদার নজরুলের ধর্মভাবনা সম্বন্ধে বলেছেন :

"Nazrul in life as well as in unfathomed depth of soul was as much a 'Kali-bhakta' as an adherent follower of Islam, a devotee of 'The One without the Second'. There was always a deep realization in him that truth is one..."[৯]

আর নজরুল নিজে উচ্চারণ করেছেন তাঁর ধর্মবোধ সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে :

"হ্যাঁ, ধর্ম সম্বন্ধে আমার আর একটু বলার আছে। আমি তো পূর্বেই বলেছি যে সব ধর্মের ভিত্তি চিরন্তন সত্যের পথ—যে সত্য আদিতে ছিল এখনো রয়েছে এবং অন্ততেও থাকবে। এই সত্যকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম। আমি তো কোনো ধর্মের বাইরের খোলসটাকে ধরে নেই। গোঁড়া ধার্মিকদের ভুল তো ওখানেই। ধর্মের আদত সত্যটা না ধরে এরা ধরে আছেন যত নৈমিত্তিক বিধিবিধান।" (বাঁধনহারা, পৃ-১১৪)

নজরুলের হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি অবলম্বনে রচিত সঙ্গীত সম্বন্ধে সাধারণভাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের কোন ধারণা নেই। তাদের তা জানতেও দেওয়া হয় না। অনেক নজরুল গবেষক মনে করেন নজরুলের হিন্দু ভক্তিগীতিসমূহ সব ফরমায়েসি রচনা। অর্থ উপার্জনের তাগিদেই তিনি তা রচনা করেছিলেন। অনুরুদ্ধ হয়েও কিছু এই ধরনের গান তাঁকে রচনা করতে হয়েছিল। সুরও দিতে হয়েছিল। ফরমাস তো ইসলামি সঙ্গীত নিয়েও ছিল নজরুলের উপর। সেই ইতিহাসও তো পাওয়া যায়। আমরা সে বিতর্কে যেতে চাই না। সব সঙ্গীত ফরমাস থেকে রচিত হয়েছে এই তথ্য সঠিক নয়।

নজরুল তো বৈষ্ণব ভাবাদর্শ নিয়ে ইসলামি সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা তো তাই বলেন,

"তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধুপূর্ণিমার সেথা চাঁদ দোলে
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।"

কিংবা

"আমিনার কোলে নাচে দুলে দুলে
শিশু নবী আহমদ রূপের লহর তুলে।"

এই সঙ্গীতে তো যশোদা ও তাঁর গোপালকেই খুঁজে পাওয়া যায়। এই গানে ইসলামি চরিত্র নেই। মা আর তাঁর শিশুপুত্র মোহাম্মদের আবির্ভাব মহিমাকীর্তনকে কোনভাবেই ইসলামি আখ্যা দেওয়া যায় না। এর ভাব বৈষ্ণবীয়। ইসলামি সংস্কৃতির নয়। অন্য একটি গানে দেখা যায়,

"ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলরে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।"

এই গানের সঙ্গে তুলনীয়,

"দেখে যা তোরা নদীয়ায়
গোরার রূপে এল ব্রজের শ্যামরায়।"

অথবা

"বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়
তোরা দেখবি যদি আয়।"

এসব গানের সুর তো একই, নজরুলের রচনা। মোহাম্মদ স্তুতির সাথে নিমাই বন্দনার সুরের সাযুজ্য খুঁজলে কী অপরাধ করা হবে ? প্রথম গানকে বরণ করা যাবে আর পরের গানকে বর্জন করতে হবে বাংলাদেশি জাতিসত্ত্বা তত্ত্বে ?

নজরুল প্রথাগত ধর্মাচার কখনও পালন করেননি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও কোনও বিশেষ ধর্মের বিশেষ উৎসবের কিংবা অনুষ্ঠানের কোন প্রভাব ছিল না। তবুও তিনি গেয়েছিলেন,

"ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাকিদ"

এবং

"ঈদুজ্জোহার তকবীর শোন ঈদগাহে।
(তোর) কোরবাণী রই সামান দিয়ে চল রাহে"

যাঁরা মনে করেন হিন্দুদের 'আনন্দময়ীর আগমনে' আনন্দধ্বনির পরিবর্তে নজরুল বাংলার কাব্য-সঙ্গীতে ঈদের খুশির ডগমগ বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ভুলে যান নজরুল আগমনী গানও কম রচনা করেননি। শরতে যে আনন্দময়ীর জন্যে হিন্দুরা উৎকণ্ঠ থাকে তাঁর আগমনে দেরি হচ্ছে দেখে নজরুল লিখেছিলেন

"(আমার) আনন্দিনী উমা আজো এল না তার মায়ের কাছে
হে গিরিরাজ দেখে এস কৈলাসে মা কেমন আছে"

নজরুলের ইসলামি সঙ্গীত রচনা ছিল তার অন্তরের মিশন আর হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি অবলম্বনে রচিত গান ছিল ফরমাসের দাবি মেটানো এই ব্যাখ্যা আমরা মেনে নিতে পারছি না। ধর্ম বিষয়ে নজরুল যা কিছু রচনা করেছিলেন তা গণসাহিত্যের প্রতি

সচেতনা বোধ থেকেই। নজরুল সেইভাবেই সমকালে ধর্ম নির্বিশেষে বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মের কোন চর্চা করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের ফতোয়াও কম ছিল না। বিয়ে করেছিলেন আশালতা সেনগুপ্তকে, যিনি হয়েছিলেন নজরুলের প্রমীলা। প্রমীলা নজরুলের জননী তাঁদের সাথেই অবস্থান করতেন। যিনি 'মুসলমান' জামাতার গৃহে অবস্থান করেও তাঁর হিন্দুত্বের শুচিতা রক্ষা করেছিলেন। প্রমীলা নজরুলও ধর্মান্তরিত হননি।

নজরুলকে খন্ডিত এবং পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল পাকিস্তানে। কিন্তু বাংলাদেশেও সেই ধারাতেই চলছে নজরুল চর্চা। ঢাকার নজরুল একাডেমীতে কবির শতবার্ষিকীর এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মোস্তফা কামাল পাকিস্তানে নজরুল সাহিত্য যেভাবে সংশোধন করা হয়েছিল তার পক্ষে জোর সওয়াল করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রয়াত সন্তোষ গুপ্ত দৈনিক 'সংবাদ'-এ জানিয়েছেন,

> "নজরুল একাডেমীতে আলোচনা সভায় গত ৭ই মে মাননীয় বিচারপতি মোস্তফা কামালের উপদেশমূলক ভাষা শুনে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছি, উদ্বেগ বোধ করছি। নতুন প্রজন্মকে যদি এভাবেই বিদ্রোহী কবির মূল্যায়ন শেখানো হয়, তবে পাকিস্তান আমলে কবি গোলাম মোস্তফা নজরুল কাব্যের পাঠ শিশুদের জন্য সংশোধন করে কোন নিন্দনীয় কাজ করেননি। 'প্রভাতী' নামক নজরুলের একটি শিশুতোষ ছড়ায় রয়েছে একটি পঙক্তি যেখানে বলা হয়েছে 'দারোয়ান গায় গান শোনো ঐ রামা হৈ।'
>
> বিচারপতি মোস্তফা কামালের ভাষায় যিনি 'আল্লাহকে নিয়ে, রসূলকে নিয়ে, ঈমানকে নিয়ে দল করেন, তিনি কী করে রামা হৈ' লেখেন। এটা কবির গুরুতর ভুল ও অন্যায়। সুতরাং পাকিস্তানে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে ওই পঙতিটি এভাবে লেখা হলো: 'দারোয়ান গায় গান, কেহ নাই খোদা বৈ।'[১০]

বিচারপতি মোস্তফা কামাল বিপুল নজরুল সাহিত্যের খোঁজ রাখেন না এমন নয়। রামের পরিবর্তে খোদাকে বসিয়ে সেই সাহিত্যের কতটুকু আর পরিশুদ্ধ করা যায়। সেই প্রচেষ্টা পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক আদর্শকে অস্বীকার করে। বিচারপতি মোস্তফা কামাল মনে হয় নজরুলকে অসাম্প্রদায়িক কবিরূপে দেখতে চান না। তিনি নজরুলকে গ্রহণ করতে চান ততটুকু যতটুকু তাঁর আদর্শের সাথে মেলে। বিচারপতি মোস্তফা কামাল নজরুল সাহিত্য সঙ্গীতে সেই আদর্শ রক্ষার প্রয়োজনে অংশবিশেষ বর্জন কিংবা সংশোধন করাকে অন্যায় কিংবা অপরাধ বলে মনে করেন না।

কিন্তু নজরুলকে কি সংশোধন করা যায়, না যায় তাঁকে ভাগ করা! তিনি হিন্দু না মুসলিম!

"হিন্দু না মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন"

নজরুলকে তো ভাগ করাও যায় না বাঙালিদের মধ্যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলায়—

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল।" (অন্নদাশঙ্কর রায়)

যতই নজরুলকে বাংলাদেশি জাতিসত্তার রূপকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হোক সেটা নজরুলের আসল পরিচয় নয়। নজরুলের স্বরূপ খুঁজতে হবে সম্পূর্ণ নজরুল সাহিত্যে—খন্ডিতভাবে নয়। কোনও অংশকে বর্জন করার কিংবা সংশোধন করার অধিকার কারো নেই। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়েরও নেই সেই এক্তিয়ার। নজরুল ছড়িয়ে আছেন কবিতায়-গানে গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে। তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। সেখানে ঈদের খুশির বার্তা যেমন আছে, আনন্দময়ীর আনন্দগানও আছে। নজরুলের ধর্ম বিচার করা যায়, কিন্তু তাঁর সাহিত্যের ধর্মবিচার করা যাবে না। নজরুলের 'অন্তরের মিশন' ছড়িয়ে আছে তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যে। সেখানে কোন বিশেষ মিশন খুঁজতে যাওয়া অন্যায়, বিলকুল ভুল।

ফলা, কলকাতা

সেপ্টেম্বর, ২০০৮

তথ্যসূত্র

১. মুস্তাফা নূর-উল-আলম—'বহমান বর্তমানের প্রহরী, তাঁর জন্মদিনে,' মওলানা আতাহার আলীর ফতোয়া। গ্রন্থ-সময়ের মুখ, তাঁহাদের কথা।
২. মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম-প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত
৫. আরিফুল হক—'আমাদের জাতিসত্তার রূপকার কাজী নজরুল ইসলাম' : দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৭শে মে, ২০০০
৬. আবু হাসান—'আমাদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা,' দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ১২ নভেম্বর, ২০০১
৭. আবদুল আজীজ আমান (সম্পাদনা), অখন্ড নজরুলগীতি, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১। প্রবন্ধে উদ্ধৃত নজরুল সঙ্গীতসমূহ উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
৮. বদরুদ্দীন উমর—'নজরুল ইসলাম অহিফেন" গ্রন্থ, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, ১৯৬৯।
৯. Kazi Nazrul Islam, Sahitya Academy, 1973.
১০. অনিরুদ্ধ—'এই ভুলটুকু' বাঁচানোর লড়াই করতে হবে, উপ সম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২১মে, ১৯৯৯।

পুনর্মুদ্রণ : কৃপাণ ও বীনা,
কাজী নজরুল ইসলাম স্মারকগ্রন্থ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ : বখতিয়ার খিলজি মুসলমানদের মুক্তিদাতা

প্রায় ৮০০ বছর আগে ৮ জুন নাকি ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বঙ্গবিজয় করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে ঢাকায় প্রথম বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বার ধারক ইনকিলাবী বুদ্ধিজীবী ও সমর্থকরা বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় বার্ষিকী পালন করেন। সেবার ছিল বঙ্গবিজয়ের ৭৯৩ তম বার্ষিকী। সেই শুরু। তারপর থেকে প্রতি বছর এই দিনটি পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রতি বছর স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তারা বখতিয়ার খিলজির উত্তরাধিকার। তাদের রক্তে রয়েছে সেই বঙ্গবিজয়ীর ঐতিহ্য।

১৯৯৭ সালে অধ্যাপক আলী আহসান বলেছিলেন,

> "মুসলমানরা যে ৮০০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছিল সে ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। বখতিয়ার খিলজিকে বহিরাগত আক্রমণ হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। বহিরাগত ছিল কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ সেনরা।"...[১]

কবি আল মাহমুদ সেদিন দাবি করেছিলেন,

> "খিলজিকে জাতীয় বীর ঘোষণা করে তাঁর নামে ঢাকায় সড়ক ও মিনার নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নামকরণ, তাঁর জীবনী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে বঙ্গবিজয় দিবস পালন করতে হবে।"...[২]

আর এক সাংবাদিক নেতা রিয়াজউদ্দিন আহমদের বক্তব্য ছিল,

> "বখতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনদের বঙ্গ থেকে বিতাড়িত করেছেন যেভাবে, সেভাবে দেবগৌড়াদের বাংলাদেশ থেকে তাড়াতে হবে।"...[৩]

অধ্যাপক আলী আহসান এবং কবি আল মাহমুদ এপার বাংলায়ও পরিচিত। অধ্যাপক আলী আহসান দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ছিলেন। কবি আল মাহমুদের কবিতা সংগ্রহ এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা কলকাতা থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিহাস বলে বখতিয়ার খিলজি কখনো বঙ্গবিজয় করেন নি। ৮ জুন, সাল তারিখ মিলিয়ে যেভাবে বঙ্গবিজয়ের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই বিষয়টি ভুল। বঙ্গ নামে তখনও কোনও রাজ্যসীমা ছিল না। খিলজি প্রথমে নদীয়া তারপরে লক্ষ্মণাবতী বা লখণোতি দখল করেছিলেন। এরপর খিলজি গিয়েছিলেন দিনাজপুরের দেবকোটে,

নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতী দুটি-ই বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। ইনকিলাব এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে খিলজিকে মহিমান্বিত করছেন তাতে রয়েছে হাস্যকরভাবে "ইতিহাস চুরি।" এই মন্তব্য বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের। বখতিয়ার খিলজির বিজয়কে বঙ্গ বিজয় না বলে খুব বেশী হলে বলা যেতে পারে মুসলমানদের গৌড় বিজয়। তাতেই বা কী আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে ইনকিলাবীদের? সৈয়দ আলী আহসান-আল মুহমুদরা লক্ষ্মণ সেনকে মনে করেন বহিরাগত বখতিয়ার খিলজি তাঁদের কাছে বহিরাগত নন। কর্ণাটকের লক্ষ্মণ সেন আক্রমণকারী আর তুর্কী বখতিয়ার খিলজি মুক্তিদাতা! কি বিচিত্র এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা। তাঁরা বাংলাদেশ থেকে দেবগৌড়দের তাড়াতে চান। বাংলাদেশে এখন হিন্দুরাই হল দেবগৌড়— লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষ। দেবগৌড়া কিছুদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেজন্যেই তাঁকে টেনে আনা। বাংলাদেশে কতজন হিন্দুর শরীরে লক্ষ্মণ সেনের রক্তের উত্তরাধিকার আছে তা তাঁরা খুঁজতে চান না। আর কতজনের শরীরে তুর্কী বখতিয়ার খিলজির রক্তের উত্তরাধিকার আছে? সৈয়দ আলী আহসানরা কী জানেন না এই অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমানের রক্তে রয়েছে মুসলমানদের শাসন কালে ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উত্তরাধিকার। তাঁরা যেভাবে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করছেন তাতে ইতিহাসবিদরা লজ্জা পাচ্ছেন।

সব বহিরাগত শক্তিকে এক সাথে নিন্দা করতে পারে না ইনকিলাব। আক্রমণকারী মুসলমান হলে দেশের ভৌগোলিক সীমানা প্রসারিত করে তাঁকে মুক্তিদাতা বলে আত্মীকরণ করে নেওয়া যায়। ইসলামে জন্মভূমির প্রতি প্রেম বা দায়বদ্ধতা বলে কোনও ভাবনা নেই। স্বদেশপ্রেম তাদের কাছে গৌরবের নয়। এখানেই তাদের দ্বিচারিতা। তাই বখতিয়ার খিলজি এখন বাংলাদেশের জাতীয় বীর। তিনি এদেশের মুসলমানদের উদ্ধার করেছিলেন নির্যাতন, নিপীড়ণ এবং অত্যাচার থেকে।

২০০১ সালে বঙ্গবিজয়ের আলোচনা সভায় কবি আল মাহমুদ আবার বলেছেন,

> "বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের ফলে আজ বাংলাদেশ ১৩ কোটি মুসলমান। তাই বঙ্গবিজয়ের ঐ দিনটি আমাদের জন্যে ঐতিহাসিক দিন"।[৫]

অন্যরা বলেছেন,

> "এ জাতিকে বাঁচাতে হলে, আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হলে বঙ্গবিজয়ের মত ঐতিহাসিক দিবসগুলিকে স্মরণ করতে হবে।"[৬]
>
> "এ দেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষকে উদ্ধারের জন্যেই ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজিকে আল্লা এদেশে পাঠিয়েছিলেন।"[৭]

এই ভাষা ইনকিলাবের। এদের কাছে মুসলমান ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই। বখতিয়ার খিলজিকে নিয়ে এরা অনেক দূর চলে গেছেন। এরা মনে করেন আল্লাহ-ই খিলজিকে এই দেশে পাঠিয়েছিলেন মুসলমানদের রক্ষা করতে। তাদের সংখ্যা বাড়াতে। এই ধারণা যে কতটা সাম্প্রদায়িক তার উল্লেখের বোধ হয় প্রয়োজন নেই। ইনকিলাব মনে করে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের ফলেই আজকের বাংলাদেশ মুসলিম স্থানে পরিণত হয়েছে। তাই তাঁকে বড় প্রয়োজন বাংলাদেশের। তাই তাদের প্রতিবছর ৮৬ জন ঈমানী চেতনা নিয়ে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় বার্ষিকী পালন করে যেতেই হবে।

দুই

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ যা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নামে খ্যাত, উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বিপ্লবী অধিনায়ক ছিলেন মাস্টারদা সুর্য সেন। ইনকিলাব চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের উত্তরাধিকার স্বীকার করে না। কারণ সে প্লিবের চেতনায় ছিল তাদের ভাষায় অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন। স্বাধীন পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ নয়। ইনকিলাব ইতিহাসের সঠিক পটভূমি এবং ঘটনার প্রেক্ষাপট স্বীকার করতে রাজি নয়। ইনকিলাবের কাছে সূর্য সেন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে ইসলামী সন্ত্রাস, ইনকিলাবের কাছে তা মুসলমানদের অস্তিত্বের লড়াই—যার ইসলামী নাম জেহাদ। আল্লাহর নির্দেশে সক্ষম মুসলমানের জেহাদে অংশগ্রহণ এবং সমর্থন অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু তাদের কাছেই আবার অমুসলমানদের অস্তিত্বের সংগ্রাম সন্ত্রাস হয়ে যায়।

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশেও পালিত হয়েছিল সূর্য সেনের জন্মশতবার্ষিকী। ঢাকা ও চট্টগ্রামের সব পার্টি প্রগতিশীল দৈনিক এই বিপ্লবী অধিনায়ককে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, ইনকিলাব সেই সময় সূর্য সেন জন্মশতবার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সাম্প্রদায়িক এবং বিদ্বেষমূলক সংবাদ প্রতিবেদন, উপসম্পাদকীয় এবং সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। সূর্য সেনের চরিত্র হনন করে প্রকাশ করেছে প্রবন্ধ নিবন্ধ। সেই সংখ্যা ছিল ১৫ দিনে ৩০টির মত। 'এত যে বিদ্বেষপ্রচার তার মূলে ছিল একটাই কারণ—সূর্য সেন হিন্দু ছিলেন। ছিলেন কালীর উপাসক। তাই তাঁর উত্তরাধিকার মুসলিমস্থান বাংলাদেশের জন্যে গ্রহণীয় নয়। ১৯৩০'র যুব বিদ্রোহের প্রাক্কালে সূর্য সেন আহ্বান জানিয়েছিলেন।

> "ভাইসব, ওঠ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তাকাও, পরাধীনতার নিদারুণ যন্ত্রণা উপলব্ধি কর, চাহিয়া দেখ তোমার মাতৃভূমি কি করুণ লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা। জার্মানি, রুশ এবং চীনের যুবক ও ছাত্ররা যে রূপে অভিযান চালাইতেছে তোমরাও তাহাই কর, তোমাদের অন্তরে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। সৈন্য হিসাবে ভারতের গণতন্ত্রী বাহিনীতে ভর্তি হও এবং মাতৃভূমিকে দুঃখ দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা কর।"[৯]

এই আহ্বানের মধ্যে কোথায় সাম্প্রদায়িকতা, কোথায় হিন্দু-মুসলমান ? ভারত উপমহাদেশে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল এবং জালালাবাদ পাহাড়ে অতুলনীয় বীরত্বের সাথে বিপ্লবীদের সশস্ত্র যুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে ভূমিকা রেখে গেছে তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সব শ্রেণীর বিপ্লবীরা। ইনকিলাব কোনও ভাবে মহিমান্বিত করতে পারে না মাস্টারদা সূর্য সেনকে। সূর্য সেন জন্মশতবার্ষিকী পালনের পর এক যুগ অতিক্রান্ত, এখনও ইনকিলাবের সূর্য সেন বিদ্বেষ কমেনি। এখনও ইনকিলাব প্রকাশ করে চলেছে উপসম্পাদকীয় সূর্য সেনকে নিন্দা করে। ১৬-১৭ মে, ২০০০, দুই দিন বিশাল উপসম্পাদকীয়তে নাট্যকর্মী ওবায়দুল হক সরকার লিখলেন—সূর্য সেনের চিন্তায় স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল না। ছিল অখণ্ড ভারত।" সেই লেখায় যে সব বিশেষণে সূর্য সেনকে ভূষিত করা হয়েছে তা লক্ষ্যণীয়,

> "শতকরা ৯০ (নব্বই) জন মুসলমানের দেশের দিশারী চরম মুসলিম বিদ্বেষী সূর্য সেন।"[১০]

সূর্য সেনকে বলা হয়েছে 'ডাকাত। ডাকাত দলের পরিচালক।' 'শিবাজী-বঙ্কিমের উত্তরসুরী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী' এবং 'মস্তান'।

ওবায়দুল হক সরকার মনে করেন, "নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিহার করে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলার অপরাধে ইংরেজ সরকারের রায়ে সূর্য সেনের যেভাবে ফাঁসি হয়েছিল, তা ছিল সঠিক।" ওবায়দুল হক সরকার আরও মনে করেন, "সূর্য সেন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সশস্ত্র বাহিনীর নাম ছিল 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মি'। স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর কল্পনায় ছিল না। সূর্য সেনকে মহীয়ান করার অর্থ অখণ্ড ভারতকে মহীয়ান করা।"[১১]

ইনকিলাব যেভাবে সূর্য সেনের চরিত্র হনন করার চেষ্টা করেছে তার ভিত্তিই হল চরম সাম্প্রদায়িক। সেখানে বিন্দুমাত্র শুভবুদ্ধিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইনকিলাব গণতন্ত্রী বাংলাদেশের ধারণায় বিশ্বাসী নয়। তারা চায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র— মুসলিম বাংলাদেশ। সূর্য সেন যখন যুব বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন সেই ১৯৩০-এ ইনকিলাবীদের পূর্বসূরীদের কারো স্বাধীন মুসলিম স্থান সম্বন্ধে কোনও স্বপ্ন ছিল? ইতিহাস চুরি করেও ইনকিলাব এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

ইনকিলাব সূর্য সেনের সহযোদ্ধা বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকেও চরম অসম্মান করেছে। ইনকিলাবের কাছে সূর্য সেন যেমন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী, প্রীতিলতাও তাই।

চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহে জীবনদান করেছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই চট্ট কন্যা প্রথম মহিলা শহীদ। অনেকদিন থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর অসাম্প্রদায়িক ছাত্রদের দাবি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রী হলের নামকরণ বীরকন্যা প্রীতিলতার নামে করার জন্যে। ১৯৯৬ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সেই দাবি বাস্তবায়িত হয়। তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ছিল শাসনক্ষমতায়। তাই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

ইনকিলাব এই নামকরণের চরম বিরোধিতা করেছিল। ইনকিলাবের পাতায় পাতায় তখন বারবার উচ্চারিত হয়েছে, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে স্মরণীয় ভূমিকা ও অবদান রয়েছে এমন মুসলিম মহিয়সী নারীর কি অভাব দেখা দিয়েছে যে প্রীতিলতার নামে হল করতে হবে?" জামাতে ইসলামীয় নেতা, প্রাক্তন সাংসদ মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ইনকিলাবে কঠোর ভাষায় বিবৃতি দিয়েছিলেন—"প্রীতিলতা একজন সন্ত্রাসী। তার নামে হলের নামকরণ হতে পারে না।" ইনকিলাব গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করেছিল চট্টগ্রামের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি এন পি) নেতা মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ও অন্যান্য আইনজীবীদের বিবৃতি। তাঁরা বলেছিলেন,

> "ওই মহিলা এতদ্ অঞ্চলের জাতিসত্তার বিকাশ ও শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নয়নের চরম বিরোধী ছিলেন।... ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে কলকাতার লেজুড়বৃত্তি ছেড়ে ঢাকা কেন্দ্রিক শিক্ষা সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। মুসলমান সহ সাধারণ মানুষের দ্রুত উন্নয়ন সহ্য করতে না পেরে প্রীতিলতা গাংরা বঙ্গভঙ্গ রদের সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু করে। তাদের সেই আন্দোলন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন ছিল না। তা ছিল এতদঞ্চলের মুসলিম উন্নয়ন বিরোধী হিংসাত্মক

আন্দোলন।... জনমতকে উপেক্ষা করে একজন বিতর্কিত ও মুসলিম বিরোধী মহিলার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের নামকরণ উদ্দেশ্যমূলক।"

এই বিবৃতির একটি বাক্যও সঠিক নয়। বঙ্গভঙ্গের সময় প্রীতিলতার জন্মই হয়নি। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সাথে বঙ্গভঙ্গের সম্পর্ক নেই। সেই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। মীর নাসিরুদ্দিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বি এন পি শাসনামলে খালেদা জিয়া সরকারে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীও ছিলেন। এই তাঁর বিদ্যা ও ইতিহাস জ্ঞানের বহর।

সেই সময় ইনকিলাব অবিরাম সংবাদ প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে প্রীতিলতার ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করার চেষ্টা করেছিল, যা ছিল কাল্পনিক এবং তথ্য প্রমাণবিহীন। একজন শহীদ কন্যাকে নিয়ে এ ধরণের অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারনা কোনও সংবাদপত্রের পক্ষেই সম্ভব নয় একমাত্র ইনকিলাব ছাড়া। একজন নারীকে এইভাবে অবমাননা করতে ইনকিলাবের ধর্মবোধও আহত হয়নি। কারণ ইনকিলাব মনে করে অমুসলমান নারীকে যে কোনও ভাবে অবমাননা করা যায়। সেই নৈতিক মানদণ্ডেই তারা বিচার করেছে প্রীতিলতাকে। সেই সময় ইনকিলাবের অশোভন আচরণ এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে বামপন্থী রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল সেন পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, "প্রীতিলতাকে নিয়ে এই মিথ্যাচার ও নোংরামির শেষ হোক।" চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নারী বেগম মুশতারী শফি লিখেছিলেন— "আর চুপ থাকতে পারলাম না।" তাঁদের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক জনকণ্ঠে। প্রীতিলতাকে নিয়ে এই যে অশালীন মিথ্যাচার তার মূলেও সেই সাম্প্রদায়িকতা। প্রীতিলতা হিন্দু-নারী না হলে এত সব অশালীন আক্রমণ হোত না। প্রীতিলতার 'সন্ত্রাসী পরিচয়ের চেয়েও সেই পরিচয়টাই ইনকিলাবের কাছে বড়। তিনি যে কাফের-কন্যা। তাঁকে তো মহিয়সী করা যায় না। বহু দূর বিদেশের, প্যালেস্তাইনের গেরিলা নেত্রী লায়লা খালেদের প্রসঙ্গে ইনকিলাবের শ্রদ্ধা ঝরে পড়ে। স্বদেশের প্রীতিলতা তাদের কাছে পরিত্যাজ্যা, তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোকে ইনকিলাবের মনে হয় 'এসব কিসের আলামত।' মুসলিম না হলে কারো সংগ্রামকে, আত্মদানকে স্বীকার করে না ইনকিলাব। তাঁরা কখনও মুসলিম বাংলাদেশের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের অংশ হতে পারে না।

তথ্যসূত্র :

১-৩. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৮ জুন, ১৯৯৭
৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৩ জুন, ১৯৯৭
৫-৭. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৯ জুন, ১৯৯৭
৮. ইনকিলাবের অপসাংবদিকতা, সম্পাদনা—মোহাম্মদ শাজাহান, ঢাকা, ১৯৯৫
৯. চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন, চট্টগ্রাম, ১৯৮০
১০-১১. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৬-১৭ মে, ২০০০
১২. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২২ জুন, ১৯৯৭
১৩. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ২৪ জুন, ১৯৯৭
১৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ২৭ জুলাই, ১৯৯৭

রচনাকাল
মার্চ, ২০০২

পর্বান্তর কলকাতা
সেপ্টেম্বর, ২০০৮

বাংলাদেশ : ধর্ম-সংস্কৃতি-উত্তরাধিকার

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির বয়স প্রায় দুই কুড়ি বছরের কাছাকাছি। তাকে আর শিশু রাষ্ট্র বলা যায়না। এই রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্রধর্ম আছে। সেই ধর্ম হল ইসলাম। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই রাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এই পরিসংখ্যান নিয়ে অবশ্য দ্বিমত আছে। তবে তা এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। বাংলাদেশ অবশ্যই মুসলিম প্রধান দেশ। তবুও তার সব মানুষ মুসলমান নন। কিন্তু বহুজাতিক বা বহুধর্মের দেশ বলে এই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। রাষ্ট্রধর্মে অবিশ্বাসী অন্য ধর্মের লোকজন যারা আছেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আর তাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে 'শান্তি'তে বসবাস করতে পারবেন। সেই নিশ্চয়তা রাষ্ট্র তাদের দিয়েছে। কিন্তু তাদের নাগরিক মর্যাদা নিয়ে রয়েছে অনেক প্রশ্ন, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা তাই বলেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রধর্ম ও তার অমুসলিম নাগরিক নিয়ে নতুন করে এখানে কিছু বলতে চাই না। আমাদের অন্য কিছু কথা আছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ কী হবে, কীসের ওপর ভিত্তি করে তাকে খুঁজে নিতে হবে? রাষ্ট্রের ধর্ম কী প্রাধান্য পাবে 'নতুন সংস্কৃতি' নির্মাণে? না বাংলার মাটি, প্রকৃতি ও উত্তরাধিকারের মধ্যেই তাকে নবরূপ দিতে হবে। পন্ডিতেরা মনে করেন সংস্কৃতি কোন ও দেশে কোনও কালে ইচ্ছেমত নির্মাণ করা যায় না। সংস্কৃতি তার নিজের নিয়মেই গতিশীল প্রবহমান, কালের গতিতেই সে যা কিছু সঞ্চয় করার করে নেয়, যা বর্জন করার দূরে ফেলে দেয়। সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী তার বহুবিখ্যাত রচনা 'সংস্কৃতি কথা' তে বলেছেন :

"প্রবলভাবে বাঁচা বাঁচা নয়, মৃত্যু। প্রচুর ভাবে গভীর ভাবে বাঁচাই বাঁচা-সংস্কৃতিকামীই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে। মতবাদ ঝড়ের মতো এসে জীবনের সমস্ত মুকুল ঝরিয়ে দেয়। সংস্কৃতি ঠিক তার উল্টো, দখিন হাওয়ার মতো জীবনের সমস্ত ফুল ফুটিয়ে তোলাই তার কাজ। তখন কতো রং, কতো বৈচিত্র্য, কতো সৌন্দর্য, একসুরা, একরঙ্গা, জীবন মতবাদীর, সংস্কৃতিকামীর নয়। সংস্কৃতি সাধনা বহুভঙ্গিম জীবনের সাধনা। Let us agrer to differ-ভিন্নরূপচাই। লোক: এই উক্তিতে মতবাদীর আস্থা কম, অথচ সংস্কৃতিকামীর কাছে এর চেয়ে শ্রদ্ধেয় বাণী আর নেই।"

মোতাহের হোসেন চৌধুরী মতবাদের শৃঙ্খল সম্বন্ধে যা বলেছেন ধর্মের শৃঙ্খলা নিয়েও তা বলা যায়। সেই শৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না বর্তমান বাংলাদেশের

সংস্কৃতির সাধনা। বাংলাদেশে এখন শিল্প ও সংস্কৃতির ধারণা দুই বিপরীত মেরুতে। যাঁরা মুক্তবুদ্ধির দলে তাঁদের কথা থাকুক। কিন্তু যাঁরা অন্য মেরুতে অবস্থান নিয়েছেন তাঁদের সংস্কৃতি ভাবনা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব।

বাংলাদেশ জন্মলাভ করার পর প্রথম যে সংবিধান রচিত করেছিল তার চারটি মূলনীতি ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি সামরিক ফরমান দিয়ে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র বর্জন করেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদ সংজ্ঞা পাল্টে হয়ে যায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের কোনও সংস্কৃতি নেই। তাই তিনি নতুন সংস্কৃতি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছু পত্র পত্রিকায় তখন বাংলাদেশীদের নতুন সংজ্ঞায় চিহ্নিত করতে দেখা যায়। সেই ভাল বাংলাদেশী, যে ভাল মুসলমান। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় ভাল বাংলাদেশী হওয়ার জন্যে যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি।

মমতাজুর রহমান তরফদার 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা' গ্রন্থে বলেছেন :

"জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগের তলায় সাম্প্রদায়িকতা চাপা পড়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি তাই অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণভাবে শক্তি সঞ্চয় করল। শিক্ষিত হিন্দুগণকে ভারতের গুপ্তচর হিসেবে চিহ্নিতকরণের রেওয়াজ চালু হলো। বর্তমানে হিন্দু মধ্যবিত্ত চূড়ান্তভাবে হতাশাগ্রস্ত। বিরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশ, বৈষয়িক উন্নতির ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাহীনতা এবং সব কিছুর ওপরে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে নিরাপত্তার অভাব এই মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।..."

নতুন সংস্কৃতি নির্মাণ করতে গিয়ে জেনারেল রাষ্ট্রপতি প্রথমেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি ভালবাসি পিছনের দরজা দিয়ে বদলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন সময় না পাওয়ায় তা কার্যকর করে যেতে পারেননি। তিনি অলিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশে বিদেশে সব রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে গাইতে হবে :

"প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ"

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সঙ্গীতাচার্য ওয়াহিদুল হক মন্তব্য করেছিলেন: রক্ত দিয়ে সত্য করা বাংলাকে সকল সম্পূর্ণ জাতীয় তার সংগঠক সেই পরশমণিটিকে জাতীয় ঐক্য বিনির্মাণ ত্যাগভিত্তিক কর্মযজ্ঞের আবাহনী কার্যে প্রয়োগ না করে তার জায়গায় পিছন দরজা দিয়ে 'প্রথম বাংলাদেশ শেষ বাংলাদেশ' জাতীয় অপমানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে চালু করাবার মতো অবমাননা ফরমায়েশি সংস্কৃতির কুণ্ঠাহীন অবতার মোনেম খাঁকে দিয়েও কল্পনা করা যায় না।" (সঙ্গীত সংস্কৃতি, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৮২)

পূর্বপাকিস্তানের এককালীন গভর্নর মোনেম খাঁকে এখানে আর তুলে ধরতে চাই না। জেনারেল রাষ্ট্রপতি রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার কথা বলেননি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর

কোনও জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না। পূর্ব পাকিস্তানে একসময় রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ হয়েছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত সেই নষ্ট বুদ্ধিতে সমর্থন যুগিয়েছিলেন অনেক খ্যাতিমান বাংলাভাষী কবি, সাহিত্যিক সঙ্গীতশিল্পী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ থাকেননি। সে অনেক কথা। এখন তা ইতিহাস। এখন তাঁদের উত্তরসূরীদের আমরা বাংলাদেশী রূপে চিনতে পারি। বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন সংগ্রাম প্রেরণা। "রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশপ্রেম শিখিয়েছেন। ৭১ সাল সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' সৃষ্টি করেনি, 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি আহ্বানই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজকে আমাদের মানসপটে উপ্ত করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশকে সম্ভব করেছে।" (সরদার ফজলুল করিম, ঢাকায় ২য় জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ থেকে, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৮২)

স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার জন্যে তাঁর রচিত জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের দাবি তুলে কয়েক বছর থেকে একত্রিত হয়েছেন নতুন একটি গোষ্ঠী। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ' দৈনিক ইনকিলাব' হল তাদের মুখপত্র, আরও কিছু পত্র পত্রিকা এই দলে যুক্ত হয়েছে। তাঁদের কথার মূল সুর হল :

"বাংলাদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সাথে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, স্বপ্ন, রাষ্ট্রচিন্তার কোন মিল নেই, ছিল না। তিনি আমাদের অবহেলায় এড়িয়ে গেছেন।"

(দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০১)

তারা নানাভাবে প্রমাণ করতে চান যে, রবীন্দ্রনাথ মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক কবি। তাঁর রচিত জাতীয় সঙ্গীত ইসলাম বিরোধী পৌত্তলিক ভাবধারায় পূর্ণ। এই সঙ্গীত গাইলে মুসলমানদের ইমান আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

একনদী রক্ত দিয়ে মুক্তিসেনানীরা স্বাধীন করেছিল বাংলাদেশকে। মুক্তিযুদ্ধে এই দেশের লক্ষ সন্তান মুক্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন :

"বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের এই বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের তাহার নাইকো শেষ"

জীবনানন্দ দাশকে বলা হয় রূপসী বাংলার কবি। তিনি বার বার এই বাংলায় জন্ম নিতে চেয়েছিলেন শুধু মানুষ হয়ে নয়, শঙ্খচিল শালিখ, ভোরের কাক, হাঁস, লক্ষী পেঁচা বা ধবল বক হয়ে। বাংলাকে ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে চাননি।

"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব।"

জীবনানন্দ দাশকে চিহ্নিত করা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদ ও জন্মান্তরবাদের কবি রূপে। তিনি নাকি প্রচার করে গেছেন ইসলাম বিরোধী ভাবধারা, বারবার জন্ম নিতে চেয়ে, শুধু মানুষ হয়ে নয় নানা রকম পাখি হয়েও। তাঁর কবিতা পাঠ করলে বাংলাদেশের মুসলমান বালক-বালিকারা খুব সহজেই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। এই অভিনব উপলব্ধি নাট্যকর্মী ওবায়দুল হক সরকারের। (ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর, ১৯৯৯। এখানে উল্লেখ্য যে জীবনানন্দ দাশের 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি বাংলাদেশের স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত,) বাংলাদেশী সংস্কৃতি কোনও ভাবেই তাই বরিশালের কবি জীবনানন্দ দাশকে ধারণ করতে পারে না।

কিন্তু নজরুলকে পারে। যদিও তাঁর জন্ম বাংলাদেশের ভূগোলের বাইরে পশ্চিম বাংলার বর্ধমানের চুরুলিয়ায়। নজরুল তো কত গানে কবিতায় জন্মান্তরের কথা বলেছেন:

"জানিলাম আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি"

অথবা

"পর জনমে যদি আসি এ ধরায়
ক্ষণিক বসন্ত যেন না ফুরায়"

কিংবা

"মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে
যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে"

অজস্র উদাহরণ আছে নজরুলের কবিতার গানে। কিন্তু তাঁকে কখনও হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত জন্মান্তরবাদ প্রচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর নজরুল ভক্ত মনে করেন নজরুল সৃষ্টিতে নাকি শুধু ইসলামের জয়গান।

"বন্যা যেমন পলিমাটি বহন করে এসে নদীর দুই কুলকে উর্বর করে তোলে, নজরুল তেমনি উর্বর করে তুলেছিলেন মুসলিম মানসকে। নজরুল যেমন অতি স্বচ্ছন্দেই ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করলেন তেমনি মুসলমানদের মনে সৃষ্টি করলেন আত্মবিশ্বাস।" (আবু হাসান, 'আমাদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা, ইনকিলাব ১২ নভেম্বর ২০০১)

নজরুলকে বলা হচ্ছে মুসলিম সাহিত্যের অগ্রপথিক, ইসলামী সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ গীতিকার। কিন্তু তিনি যে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদকেও প্রায় ছাড়িয়ে গেলেন, রচনা করলেন এত সব কৃষ্ণকীর্তন, ভজন ছাড়াও কত দেব-দেবী অবতার বন্দনা ও স্তবগান তার বেলায় তাঁরা নিশ্চুপ। নজরুল তো রসূল মোহাম্মদের আবির্ভাব মহিমাকে মিশিয়ে দিয়েছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় :

"ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়"
এই গানের সাথে তুলনীয়
"দেখে যা তোরা নদীয়ায়
গোরার রূপে এল ব্রজের শ্যামরায়"

অথবা

"বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়
তোরা দেখবি যদি আয়।"

এসব গানের সুরতো আলাদা নয়, মোহাম্মদের জন্ম আর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আনন্দধ্বনি তো মিলে যায় একই সুর নদীতে। তারপরও নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের

জাতীয় কবি। কিন্তু সেই নজরুল খণ্ডিত, অস্বচ্ছ। তাঁর সাহিত্য সঙ্গীতের বিপুল অংশ পরিত্যাজ্য।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে চট্টগ্রামের কবি আলাওল আছেন। নেই 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি চট্টলসন্তান নবীনচন্দ্র সেন। নজরুল এই কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রচনা করেছিলেন দীর্ঘ কবিতা :

"অঞ্জলি, পুরিয়া মম ভাগিরথী নীরে
দাঁড়ায়েছি আসি তব কর্ণফুলী তীরে।
বীর কবি লহ লহ এ মোর তর্পণ
অপরিচিতের এই পূজা নিবেদন।"

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন উপাচার্য ছিলেন 'বাংলার বিবেক' বলে খ্যাত চট্টল সন্তান আবুল ফজল। প্রবাসী এক চট্টল সন্তান তাঁকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি নবীনচন্দ্রের নামে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি অথবা একটি বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা প্রবর্তনের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। উপাচার্য আবুল ফজল সেদিন গভীর দুঃখে লিখেছিলেন (২রা অক্টোবর, ১৯৭৪) :

".... স্বাধীনতার আগে যে সবল নেতৃত্ব আমরা দেখেছিলাম, স্বাধীনতার পর যে এত ভঙ্গুর ও দুর্বল প্রমাণিত হবে তা আমরা ভাবতে পারিনি। আমরা যারা বাঙালি চরিত্রের মহত্ত্বের দিকটা কিছু কিছু দেখেছি আজ তাদেরই মর্মবেদনা সবচেয়ে বেশি।" (সম্পূর্ণ চিঠিটি পশ্চিমবঙ্গের " দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ৩০ জুলাই, ১৯৮৩ তে)

সেই ভঙ্গুর ও দুর্বল নেতৃত্বই কী কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলেছিল? সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও ইতিহাসের বিবরে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিতে লালনফকিরও গ্রহণীয় নন। লালন কিন্তু শুধু একটি নাম নয়—একটি প্রতিষ্ঠান। অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী একটি সামাজিক আন্দোলন।

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন কয়, জেতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে"

ধর্ম ও জাতিভেদের প্রতি তীব্র ঘৃণা, শ্লেষ ও বিদ্রোহ লালনগীতির মূলমন্ত্র। এখানেই আপত্তি অধ্যাপক আবু জাফরের। তিনি মনে করেন লালনের গান ইসলাম বিরোধী :

"প্রকৃতপক্ষে তিনি শিরক, বিদআত ও গোমরাহির এক চূড়ান্ত নমুনা। তাঁর মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান বাঙ্গালী সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে, যে কোন কারণেই হোক যত মূল্যবান ও মরমিয়া পরিচয়ই বহন করুক, লালন আসলে মুসলমানদের আকীদা ও ঈমানবিধ্বংসী এক জঘন্য মহানায়ক। তাঁর ও তাঁর গানের প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা পোষণ করাও ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়াবহ অপরাধ। শুধু অপরাধ নয়, লালনের বক্তব্যের সাথে ক্ষীণভাবেও যদি ঐকমত্য পোষণ করা যায়, ঈমানই থাকে না।" (ইনকিলাব, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯)

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল। রাজধানী ঢাকায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে ছাত্রবিক্ষোভ হয়েছিল তাতে গুলি চালিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার। বরকত-সালাম-রফিক-জব্বারের বুকের রক্তে রক্তাক্ত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। জন্ম হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের। মাতৃভাষার মর্যাদার দাবি পরবর্তীতেতে রূপান্তরিত হয়েছিল স্বাধিকারের দাবিতে। যেখানে রোপিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার অংকুর। বাংলার মানুষ যে শুধু মুসলমান নয় তারা যে বাঙালি সেই চেতনার উন্মেষ একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তদানে।

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি"

আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত, '৭১র শহীদ আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত এই গান বাংলাভাষার, বাঙালি জাতির বাংলাদেশের মহত্তম ঐতিহ্য। একুশের শহীদদের যেখানে রক্ত ঝরেছিল সেখানে নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার যা পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছে সব গণ-আন্দোলনের প্রেরণাস্থল। একুশের ভাষা শহীদমিনার এখন বাঙালি জাতির পরিচয় চিহ্নের স্মারক। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরী আর মিছিল করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় সেই মিনারে। ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় শহীদ মিনার। চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আলপনায় আলপনায় রাঙিয়ে তোলে শহীদ মিনার আর সব সংযোগ সড়ক। দেওয়ালে দেওয়ালে অঙ্কিত হয় কত বিমূর্ত চিত্র, বাংলা বর্ণমালা। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন শুধু বাংলাদেশের সম্পদ নয়। সেই সম্পদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্বময়। সারা বিশ্বে এখন এদিন পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে। এই গৌরব বাঙালির, বাংলাদেশের। শহীদ মিনারের এই সংস্কৃতি বাংলাদেশের প্রথম সেনাপতি রাষ্ট্রপতির ধারণানুযায়ী কেউ নির্মাণ করে দেয়নি। ভাষা শহীদের রক্তকে স্মরণ করে আবহমান বাংলার রূপ থেকেই তা উঠে এসেছে। পাকিস্তানে যা নিয়ে কোনও বিতর্ক সৃষ্টির সুযোগ পায়নি মৌলবাদীরা। স্বাধীন বাংলাদেশে তা নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনও কোনও বছর তারা হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ মিনারের ফুল, আলপনা অংকিত চিত্র সব নষ্ট করে দেয়। তাদের কাছে তা হল ইসলাম বিরোধী। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেনাপতি রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা দখল করে এদের উৎসাহিত করেছিলেন :

"ভাষা আন্দোলনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল শহীদ মিনার, কিন্তু আমরা দেখি সেখানে আলপনা আঁকা হয়, একাজ ইসলামী বিরোধী। শহীদ বরকত আল্লাহর বান্দা, তার জন্য আলপনা কেন কোরআনখানি করতে হবে।" (দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৮৩)

এই সেনাপতি আবার রাষ্ট্রপতি হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানদের কাছে পবিত্র ভাষা হল আরবী ভাষা, যা কোরানের ভাষা, আল্লাহর ভাষা। তার ওপরে মাতৃভাষা, মর্যাদা পেতে পারে কিনা মাঝে মাঝে সেরকম একটা বিতর্ক উস্কে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়। শুধু জন্মদাত্রী নয়, মাতৃভূমিও এদেশের মানুষের কাছে জননী, তার সাথে মর্যাদা পেয়েছে ভাষা জননী। মা-মাটি মায়ের ভাষা। ইসলামের দৃষ্টিতে এই

ভাবনার মধ্যে আছে পৌত্তলিকতা। মুসলমানদের জীবনভাবনায় তা ধর্মবিরোধী। এই ভাবনা থেকে যারা বেরিয়ে আসবেন তাদের ঈমান নিয়েই প্রশ্ন তোলা যায়।

বাঙালির পয়লা বৈশাখে নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠান তেমনি পৌত্তলিক ধারণা থেকে জাত বলে মনে করেন বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় মানুষরা। তাদের দৃষ্টিতে বর্তমানে যে ভাবে বর্ষবরণ পালিত হয় তা পুরোপুরি অনৈসলামিক। এদেশের গ্রাম বাংলায়, শহরে বন্দরে নতুন বর্ষকে বরণ করা হত নানা রকম মঙ্গলাচারে। হালখাতা অনুষ্ঠান, মেলা আর আড়ং এর আয়োজন কত কত বছর ধরে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। ১৯৬৪ সালে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট' ঢাকায় রমনা পার্কের বটমূলে প্রথম গানে গানে নতুন বাংলা বছরকে বরণ করে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে। সেই পথ চলা শুরু। 'ছায়ানট' বর্ষবরণের নতুন যে সংস্কৃতির সূচনা করেছিল পূর্ব-পাকিস্তানে তা প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের উত্তরাধিকার। বছরে বছরে তাতে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। ঢাকার সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এখন নানা জায়গায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এখন বাংলাদেশের মহত্তম জাতীয় অনুষ্ঠান। সেদিন নব প্রভাতের সূর্য ওঠে নব আনন্দে। রাস্তায় সেদিন আবাল বৃদ্ধ-বনিতার ঢল নামে। এই উৎসব এখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে। এই উৎসব তুলে ধরছে বাংলাদেশের সংস্কৃতির পতাকাকে। অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ বেশ কয়েক বছর থেকে এর সাথে যুক্ত হয়েছে বৈশাখী মেলা ও আনন্দ মিছিল। ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা পরিচালনা করে আনন্দ মিছিল। বর্ণাঢ্য র‍্যালী সেদিন ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে, সেই র‍্যালীতে থাকে হরেকরকম মানুষ, পশু-পাখির প্রতিকৃতি ও ব্যঙ্গাত্মক মুখোশ। তারা সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে নিন্দা জানায় নৃত্যের তালে তালে বাংলাদেশের ঢাক ঢোলের বাজনা বাজিয়ে। পূর্বপাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে সংস্কৃতি কর্মীরা যে প্রতিবাদী চেতনা থেকে বর্ষবরণ উৎসব শুরু করেছিল বাংলাদেশেরমুক্তি সংগ্রামে তা প্রেরণা হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই উৎসব, এই আনন্দমিছিল বরদাস্ত করতে পারছেনা বাংলাদেশের একটি গোষ্ঠী। তাদের ভাষায় এই উৎসব ও আনন্দ মিছিল হচ্ছে বাংলাদেশের নতুন করে পৌত্তলিক সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ। হিন্দুবাদী সংস্কৃতির আধিপত্যের সম্প্রসারণ। ২০০১ সালে ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ) আক্রান্ত হয়েছিল রমনার বটমূলের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। বোমা বিস্ফারণে নিহত হয়েছিলেন ১০ জন, আহত অনেকে, কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল তা তদন্ত করেও উদঘাটন করা যায়নি। কারণ যারা তখন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল তাদের এক অংশ জড়িত ছিল এই ঘটনার সাথে। বাংলাদেশে নতুন যে মৌলবাদী চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে বাংলা নববর্ষকে 'সুপ্রভাত' বলে আহ্বান জানানো বিজাতীয় সংস্কৃতি। নববর্ষে উন্মোচিত হবে ধর্মীয় চেতনার। সেদিন আয়োজন করা হবে মিলাদ মাহফিলের। সঙ্গীত নৃত্য-বাজনা-আনন্দ র‍্যালী নয়। বর্ষবরণ কোনও উৎসব নয়। (ইনকিলাব ২৪ এপ্রিল, ২০০০)। দুই ঈদ ছাড়া মুসলমানদের জীবনে আর কোনও উৎসব নেই। এই ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সরকারি কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক। যে

কোন উৎসব অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়া, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো নাজায়েজ। ইসলাম তা অনুমোদন করেনা। তাই মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। র‍্যালিতে যে সব পশু পাখির চিত্র শোভা পায় তাদের মনে করা হয় হিন্দু দেব-দেবীর বাহন। ঢাক-ঢোলের বাজনা হল পূজার বাজনা। যার অর্থ নববর্ষের আনন্দর‍্যালী হল হিন্দুদের কাছে আত্মবিসর্জন, যাকে প্রতিহত না করলে বাংলাদেশকে বাঁচানো যাবে না। মুক্ত করা যাবে না বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে বিধর্মীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে। তারা এভাবেই বিভ্রান্ত করছে সাধারণ মুসলমানদের।

ঢাকায় এখন শুধু বর্ষবরণ নয়, কয়েকবছর থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে নবান্ন ও বসন্তোৎসব। ঋতুভিত্তিক এই সব উৎসবকেও বর্জন করার আহ্বান জানচ্ছে মৌলবাদীরা। যুক্তি তাদের অকাট্য। এই সব উৎসব হল বেলাল্লাপনা। ঋতুকে নিয়ে উৎসব পালন হল সরাসরি প্রকৃতি পূজা। হিন্দুদের পূজাভিত্তিক উৎসবের অনুকরণ। যা সম্পূর্ণ রূপে ইসলাম বিরোধী।

প্রথম জেনারেল রাষ্ট্রপতি সংবিধানে যেভাবে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বদলে বাঙালির জায়গায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিস্থাপন করে গেছেন তার শিকড় এখন গভীরে ঢুকে গেছে। তাই আরিফুল হকের মত নাট্যকর্মী মনে করেন :

"৭১ এর মুসলিম জাতিসত্তা মুছে গিয়ে আমরা হলাম বাঙালি। এভাবেই আমাদের চিন্তা-চেতনায়, ঐতিহ্যরীতিতে, সাধে, অভিলাষে, ভারতীয় হিন্দু রাষ্ট্রদর্শনের দূরভিসন্ধিমূলক জাতীয়তাবাদের চেতনা এমনভাবে ইনজেক্ট করে দেওয়া হল যে, মানুষ ভুলে গেল বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির জন্ম ইতিহাস কী? এর প্রয়োজনীয়তাই বা কী ছিল :..

.... ১২ কোটি মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসকে বলা হচ্ছে মৌলবাদ। মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে বাঙালি নামক হিন্দুত্ববাদী খোদাবিমুখ জাতীয়তাবাদ। কুরআন হাদিস ভিত্তিক ধর্মবিশ্বাসকে সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধত্ব নামে অভিহিত করে ঔদার্যের নামে আকবরের দ্বীন-ই-লাহী প্যাটার্নের সেকুলারিস্ট ধর্ম ব্যবস্থার প্রচলন করা হচ্ছে। যে ইসলামের ভিত্তি, জীবনপদ্ধতি এবং আচরণ শিক্ষিত করেছে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, ওহী ও রিসালাতের প্রতি প্রত্যয় এবং আখিরাত এর প্রতি আস্থা স্থাপন করে। সেই ৯৫ ভাগ মুসলমানের দেশে সরকারি অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করা হচ্ছে একেশ্বরবাদী কুরআনের সাথে সাথে বহু ঈশ্বরবাদী গীতা, ঈশ্বরহীন ত্রিপিটক বা বাইবেল পাঠ করে।...." (ইনকিলাব, ঢাকা, ১৯৯৯)

একজন সংস্কৃতিকর্মীর এই হল চিরন্তন বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জীবন ভাবনা। সংস্কৃতির কোনও ধর্ম থাকেনা। যদিও ধর্ম সংস্কৃতিকে পূর্ণ করে। আরিফুল হকদের বাংলাদেশে মুসলমান ছাড়া আর কারো কোনও স্থান নেই। তিনি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বাঙালি হলেও যে কোনও অমুসলমান মনীষীকে স্মরণ করার বিরোধী, কিন্তু মুসলমান হলে তাঁকে, বাংলাদেশের বাইরের মানুষ হলেও বরণ করা যাবে। দুনিয়ার সব মুসলমান হযরত আদম থেকে জাত ভ্রাতা-ভগ্নী। তাদের বেলা ভৌগোলিক সীমারেখা কোনও বাধা নয়।

"এদেশে বিদেশী শক্তির বশংবদদের হাতে স্মরণোৎসবের নামে রবীন্দ্র, বঙ্কিম, জীবনানন্দ, মাইকেল, সূর্যসেন, বিদ্যাসাগর, প্রীতিলতা যত প্রাধান্য পান, আমাদের জাতীয় অগ্রনায়করা যেমন— নজরুল, ফররুখ, কায়কোবাদ, গোলাম মুস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, ইকবাল, সিরাজদৌলা, চাঁদ সুলতানা, তিতুমীর, শরিয়তুল্লাহ, আমির আলি, নওয়াব আব্দুল গনি, নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রমুখ স্মরণীয় মানুষগুলোকে ততটাই অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়।" (প্রাগুক্ত)

বাংলাদেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও তাই বিক্রমপুরের জগদীশচন্দ্র বসুকে দেখা যায় না। যে বিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধা জানায় সমগ্র বিশ্ব, বাংলাদেশের এককালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা মেঘনাদ সাহা যে বিজ্ঞানীরা সমৃদ্ধ করে গেছেন বিজ্ঞান জগৎ-কে, এদেশে তাঁদের স্মরণ করা যেন জাতীয়তাবাদ বিরোধিতা। বাংলাদেশের বার ভূইয়াদের এক ভূইয়া সোনারগাওয়ের ঈশা খাঁ পরম বরণীয়। কিন্তু অন্য আরেক ভূঁইয়া যশোহরের প্রতাপাদিত্য এদেশে অচ্যুত। কজন জানেন কান্তকবি রজনীকান্ত সেন বাংলাদেশের পাবনার গৌরব। বাংলা সঙ্গীতে তাঁর অবদান যতই থাকুক না কেন তাঁকেও দূরে ঠেলে দিতে হয়। অজ্রস উদাহরণ কত আর উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা এখন সংগ্রাম করে চলেছে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম বাংলায় রূপান্তরিত করতে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে-ধর্ম, রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতিতে এখানে শুধু তৌহিদবাদীরাই থাকবেন।

বাংলাদেশ বছরে দুটি দিন জাতীয় দিবস রূপে পালন করে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। প্রথম দিন ঘোষিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা, দ্বিতীয় দিন দেশ শত্রুমুক্ত হয়েছিল। কয়েকবছর হল ইনকিলাবকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী জাতীয় দিবস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যথা দেখা যায়নি। দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনায় না গিয়ে এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি।

"আমাদের জাতীয় দিবস পালনের ক্ষেত্রে এক অস্পষ্টতা বিরাজ করছে। ২৬ মার্চকে আমরা জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করি। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমরা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দেশ থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করি। এর আগে আমাদের নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মার্চ মাসটা ছিলো মূলত আওয়ামী লীগের ক্ষমতা প্রাপ্তির আলোচনা মাস। ২৫ মার্চ রাতে সেনাবাহিনী আমাদের আঘাত হানে। ২৬ মার্চ সকালে কিছু কিছু, ২৭ মার্চ থেকে ব্যাপক হারে লোকজন পালাতে শুরু করে,... মার্চ মাসে এদেশের মানুষ বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থান বা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দোলনে লিপ্ত ছিল না। বরং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতা প্রাপ্তির চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমরা এমনকি জানতেও পারিনি যে, সেনাবাহিনী আমাদের উপর আঘাত হানতে যাচ্ছে। শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর হাতে ধরা দিলেন। একদিকে প্রাণভয়ে আপামর জনতার দেশ ছেড়ে পলায়ন। অন্যদিকে জননেতা শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণ এই দুই উল্লেখযোগ্য ঘটনা দিয়ে ২৬ মার্চ, এ দিনটি কি করে আমাদের জাতীয় দিবস হবে?" (দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০১)

আমাদের জাতীয় দিবস নিয়ে এই ভাবনা ইনকিলাবের সাংবাদিক ও কলামিস্ট ওবেইদ জায়গীরদারের। ১৯৭১'র মার্চের অসহযোগ আন্দোলন, শেখ মুজিবের ৭ মার্চের রেসকোর্সের ভাষণ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা, ২৫ মার্চের কালো রাত্রির পৈশাচিক গণহত্যা কোনও কিছুই যেন ওবেইদ জায়গীদার জানেন না, যেই ' সেনাবাহিনী আঘাত হানে' তাদের নামের সাথে তিনি 'পাকিস্তানী' পরিচয় পর্যন্ত যোগ করেননি সচেতনভাবে। ২৬ মার্চের স্বাধীনতা দিবস স্বীকার না করলে 'পাকিস্তানী' থাকা যায়, 'বাংলাদেশী' ও হওয়া যায় না। তিনি বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৭ এপ্রিলকে স্বীকার করেননা। কারণ, তখন "বাংলাদেশের না আছে স্বাধীনতা, না আছে সার্বভৌমত্ব।" তিনি বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামে প্রবাসী সরকারের ইতিহাস পড়েননি।

ওবেইদ জায়গীরদার ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস রূপেও স্বীকার করেনা না :

"১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছিল। সে বক্তব্য সঠিক নয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীও আমাদের শত্রু, সে প্রমাণ আমরা ১৯৪৭ এ পেয়েছিলাম। গত ৩০ বছর ধরেও পাচ্ছি। তারা ১৬ ডিসেম্বর এদেশ ত্যাগ করেনি এবং বিনা প্রতিবাদেও বাংলাদেশ ছাড়েনি। সুতরাং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় দিবস হতে পারে না। আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করেছি ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট। তাই ১৪ আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস হওয়া উচিত" (প্রাগুক্ত)

তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেই স্বীকার করেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মর্মবাণীর ওপরেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মনে করেন পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের যে বিরোধ তা ছিল ভ্রাতৃবিরোধ "এ হলো ভাগাভাগির সমস্যা, অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয়। একে পরাধীনতা বলব কোন যুক্তিতে? পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা আর ব্যাপক নারীধর্ষণ তাঁর কাছে ভ্রাতৃবিরোদের পরিণতি। অধিকৃত বাংলাদেশে এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ফেলে প্রাণ বাঁচাতে শরণার্থী রূপে ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারত তাদের শরণার্থী রূপ আশ্রয় দিয়ে তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছিল। অস্থায়ী বাসস্থান ও ওবেইদ জায়গীরদার এর মধ্যে একটা রহস্য খুঁজে পেয়েছেন। যদিও প্রাসঙ্গিক নয় মনে করে তা নিয়ে কোনও আলোচনা করেননি। (ইনকিলাব, প্রাগুক্ত)

১৯৭১'র মিত্রবাহিনী যাদের যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাই সম্ভব হতনা, ওবেইদ জায়গীরদার তা স্বীকার করেননা। তাঁর মতে সেই বাহিনী ছিল দখলদার বাহিনী, শত্রুবাহিনী। তিনি তাই নতুন একটি বিজয় দিবস খুঁজছেন। তাঁর মতে সেই দিন হওয়া উচিত যেদিন বাংলাদেশে 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর কবলমুক্ত করেছিল সেই দিন'। সেই আসল বিজয় দিবস বাংলাদেশের। কোনও দেশেই জাতীয় দিবস নিয়ে এত বিতর্ক, এত অশ্রদ্ধা সহ্য করা হয়না। লেখক কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দোহাই দিয়েও নয়। কারণ বাক-স্বাধীনতা বা লেখার স্বাধীনতা কোনও নিরংকুশ বা নিঃশর্ত ব্যাপার নয়। এ সম্পর্কে বাক স্বাধীনতার দেশ বিট্রেনেও বলা হয় :

"With the right to free speech goes ones obligation to be truthful and responsible Rights and Previleges do not have a free hand" বাক স্বাধীনতার সাথে সত্য পরায়ণতা ও দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা জড়িত। যা কিছু বলার সুযোগ তাতে নেই (অনুবাদ আব্দুল গাফফার চৌধুরী)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অনেক দেশের সৈন্যদল নিয়ে গঠিত হয়েছিল মিত্রবাহিনী যৌথকমান্ড, শত্রুদের করতলগত হওয়ার পর মুক্ত এদেশে গঠিত হয়েছিল সেইসব দেশের প্রবাসী সরকার। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর অনেক দেশেই অবস্থান ছিল মিত্রবাহিনীর সৈন্যের দীর্ঘকাল। সেই সব দেশের প্রবাসী সরকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি সেই দেশের কোনও মানুষ, সংবাদপত্র, লেখক, সাংবাদিক। মুক্ত দেশে মিত্রবাহিনীর অবস্থানে সেই দেশের বিজয় অসমাপ্ত ছিল বলেও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে কিন্তু তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ইতিহাস এদেশে বিপন্ন। কোনও কোনও সংবাদ মাধ্যমের জন্যে এখানে বাকস্বাধীনতা যেন নিরঙ্কুশ এবং নিঃশর্ত। জাতীয় দিবসকে স্বীকার না করা অনেক দেশেই রাষ্ট্রদোহিতা। কিন্তু বাংলাদেশের তা যেন কোনও অপরাধ নয়। কোন দিকে চলেছে এই দেশ?

বাংলাদেশের বয়স চার দশক হতে চলল। এই দীর্ঘ সময় কোন কোন শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ছিল সেই আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

২০০৮'র ডিসেম্বরের শেষে যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল তাতে বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল এককভাবে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে। তাদের সাথে বাম রাজনৈতিক দলগুলোর যে নির্বাচনী ঐক্যজোট এবং আরও একটি দলকে নিয়ে যে মহাজোট সংসদে তাদের মিলিত আসন তিন-চতুর্থাংশ। তারা সম্মিলিতভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে জানুয়ারি ২০০৯এ। স্বাভাবিক নিয়মে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পথে আগামী পাঁচবছরে তাদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কোনও ভয় নেই। কিন্তু অন্য ভয় আছে। বাংলাদেশের রাজনীতি বা ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে এখানে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু ১৯৭১ থেকে ২০০৯-এই দীর্ঘসময়ে বাংলাদেশের জনবিন্যাস শুধু নয় জনমানসও পরিবর্তিত করেছে। মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা সম্প্রসারিত হয়েছে সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে। রাষ্ট্রকে বেঁধে ফেলা হয়েছে বিশেষ ধর্মীয় বিধানে। যা প্রতিফলিত হয়েছে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মানস চেতনায়। তাই নতুন রাজনৈতিক সরকারের কাছে খুব বেশী কিছু আশা করা যায় না। তারা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নিয়ে নতুনভাবে কোনও শুদ্ধচেতনায় প্রবাহিত করার কথা ভাবতে পারবেনা। তাদের কাছে অস্তিত্বের লড়াইটাই এখন বড়। মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি এগিয়েই চলে। কখনও পিছিয়ে যায় না সেই আশায় বুক বেঁধে বাংলাদেশের মানুষের শুধু প্রহর গুণে যাওয়া।

আনন্দ ধ্বনি,
খুলনা

বৈশাখ, ১৪১৬

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ

কবি জীবনানন্দ দাশকে বলা যায় রূপসী বাংলার কবি। বাংলাদেশের বরিশালে তার জন্ম। পূর্ব-পাকিস্তান শুধু নাম বদল করেই বাংলাদেশ হয়নি। তার জন্যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের দিতে হয়েছিল এক নদী রক্ত। সেই মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন কবি জীবনানন্দও। মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তকণ্ঠে গাইতেন :

"বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের এই বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের তাহার নাইকো শেষ।"

যে গানের মূল বাণী ছিল অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাংলার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীবনানন্দ যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা হয়ে এসেছিলেন সেই সম্বন্ধে প্রখ্যাত সাহিত্যিক রণেশ দাশ গুপ্ত মনে করেন :

"জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছেন, এটা তাঁর কাব্যের বিপ্লবাত্মক উপাদান হিসেবেই বিবেচিত হবে।
.... জীবনানন্দ নবজীবন পিয়াসী: জনতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছেন, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।" [রণেশ দাশগুপ্ত (সম্পাদনা) ভূমিকা জীবনানন্দ কাব্য সমগ্র]

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সে দেশের বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে জীবনানন্দের বিখ্যাত কবিতা 'আবার আসিব ফিরে' পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে ১৯৯৭ সালে। [সাহিত্য কণিকা, পৃ. ১৯৯]। বাংলাদেশের মৌলবাদীদের এতে প্রবল আপত্তি। যা এখনও শেষ হয়নি। কবিতাটির কিছু অংশ তুলে ধরছি :

"আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়-হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো-কিশোরীর-ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলসীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুন ডাঙায়।"

জীবনানন্দ শুধু মানুষ নয়-পশুপক্ষী হয়েও কেন জন্মাতে চান এই বাংলায় তা বুঝে ওঠা সহজ নয় বাংলাভাষী মৌলবাদীদের পক্ষে। এই কবিতায় নাকি জীবনানন্দ হিন্দু ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ জন্মান্তরবাদের জয়গান গেয়েছেন। যা ইসলাম অনুমোদন করেনা। বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকর্মী ওবায়দুল হক সরকার মনে করেন এই কবিতা তৌহিদবাদী মুসলিম কিশোরদের জন্যে পাঠযোগ্য নয়। তিনি মন্তব্য করেছেন :

"কবি পরজন্মে মানুষ নয়, শঙ্খচিল, শালিক, ভোরের কাক, হাঁস, লক্ষীপেঁচা বা ধবল বক হয়ে এই বাংলার বুকে জন্মাবেন। জীবশ্রেষ্ঠ মানবের পশুপক্ষী হয়ে জন্মানোর সাধ কেন তা বোঝা গেল না। বালক-বালিকা সহজেই পাঠ্য বিষয় বিশ্বাস করে। কবি জীবনানন্দ দাশের মত এত বড় এক কবির এই মতবাদ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ইসলাম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেনা অথচ সেই ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে।"
[ওবায়দুল হক সরকার-কবিতার জীবনানন্দ, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১০ নভেম্বর, ১৯৯৯]

বাংলাদেশের মৌলবাদীরা মনে করেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে জীবনানন্দ দাশ গ্রহণীয় নন। তাঁকে নির্বাসনে পাঠাতেই হবে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ কম গুরুতর নয়। তিনি বারবার এই বাংলাতে জন্মাতে চেয়েছেন, শুধু নতুন কোনও জীবনানন্দ হয়ে নয়, শঙ্খচিল, শালিখ, ভোরের কাক, হাঁস, লক্ষী পেঁচা, ধবল বক কত রকম পাখি হয়ে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর এই চাওয়াটা অপরাধ। ইসলামে বার বার জন্ম নেওয়ার কোনও ধারণা নেই। মানুষের জন্ম একবারই হয়। মরনের পরে তাকে অপেক্ষা করতে হয় কবরে রোজ হাশরের (শেষ বিচারের) দিন পর্যন্ত। সেদিনই তার পাপ-পুণ্যের বিচার হবে। বিপুলা এই পৃথিবীর মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর জন্ম মরণের কোনও কথা নেই ইসলাম ধর্মে। এই শিক্ষাই শুধু দিয়ে যেতে হবে মুসলিম শিশু-কিশোরদের। তাদের কোনও ভাবেই ইসলাম বিরোধী কোনও শিক্ষা দেওয়া চলবে না। বিদ্যালয়ে কবি জীবনানন্দের কবিতা পড়ানো অর্থই নাকি কোমলমতি মুসলিম কিশোরদের জন্মান্তরবাদের পাঠ দেওয়া।

জীবনানন্দকে কাব্য সমালোচকরা অভিহিত করেছেন 'শুদ্ধতম কবি' বলে। আবহমান বাংলার শ্বাশ্বত রূপ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন আশ্চর্য আধুনিকতায় এবং ব্যাপক বহুমাত্রিকতায়। বাংলাকে ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে চাননি :

"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—
আমি বাংলার পারে রয়ে যাব।"
[তোমরা যেখানে সাধ'রূপসী বাংলা']

তিনি সারাজীবন ধরে বিশ্বকে খুঁজেছেন বাংলার রূপের মধ্যে;

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর:"
[বাংলার মুখ আমি-'রূপসী বাংলা']

জীবনানন্দের কাব্য সমালোচকও কম নন। তাঁকে বলা হয়েছে পৃথিবী পলাতক কবি। আত্মসচেতন, আত্মনিমগ্ন, তাঁকে বলা হয়েছে ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক। ক্লান্তি, অবকাশ, অবসাদ, অবসর, মৃত্যু আর বিচ্ছেদকে নিয়েই তাঁর জীবনবোধ। তিনি হলেন ঝরা পাতা আর ফসল কেটে নেওয়া রিক্ত মাঠের কবি। জীবনানন্দকে নিয়ে এই ধরনের সমালোচনা আমরা দেখেছি। কিন্তু তিনি হিন্দুত্বের জয়গান গেয়েছেন, বার বার জন্ম নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে জন্মান্তরবাদ প্রচার করেছেন এটা নতুন শুধু নয় অভিনব আবিষ্কার। জীবনানন্দ কেন, বাংলাদেশের জাতীয় কবি' নজরুল ইসলামও জন্মান্তরের কথা বলেছেন তাঁর কত কবিতায় :

"জানিলাম আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি"

[পূজারিনী-'দোলনাচাঁপা']

অথবা, "জন্ম জন্মান্তর ধরি' লোকে লোকান্তরে
তোমা করেছি আরতি"

[অনামিকা-'সিন্ধু হিল্লোল']

নজরুল কী তাই বলে জন্মান্তরবাদ প্রচার করেছেন তাঁর এইসব কবিতায়। সেই অভিযোগ তো তোলা হয়নি জাতীয় কবির বিরুদ্ধে। শুধু কবিতায় নয়, নজরুল ইসলাম তো তাঁর কত গানেও জন্মান্তরের কথা বলেছেন,

"পরজন্মে যদি আসি এ ধরায়
ক্ষণিক বসন্ত যেন না ফুরায়"

কিংবা,

"মিটিল না সাধ ভালবাসিয়া তোমায়
তাই আবার বাসিতে ভাল আসিব ধরায়"

আরো কত গান আছে, কবিতা আছে পরজন্ম, পূর্বজন্ম নিয়ে। তাই বলে তো নজরুলকে কখনও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করা হয়নি। নজরুল দয়িতাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন পরজন্মে। আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন পূর্ব জন্মের কথা :

"মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে
তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা"

বাংলাদেশের মৌলবাদীরা মনে করেন কবি নজরুল ইসলাম সবসময় 'ইসলাম' সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি তাই নাকি নির্দেশ করে। তাঁরা নজরুলকে দেখেন খণ্ডিতভাবে অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে। তাঁরা নজরুলের সৃষ্টির বিশাল অংশ লুকিয়ে রাখতে চান। তা না হলে 'জাতীয় কবি'র মর্যাদাহানি হয়।

পরজন্মে; নানারকম পাখি হয়ে জন্ম নিতে চেয়ে জীবনানন্দ না হয় বলেছেন :

"আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি"

নজরুলও তো বলেছেন :

"মোরা আর জনমে হংসমিথুন ছিলাম নদীর চরে
যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে।"

জীবনানন্দের বনহংস-বনহংসী আর নজরুলের হংস মিথুন হওয়ার কামনাকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব। তাতে করে কি কবির অন্তর্লোক স্পর্শ করতে পারব? পারব না। পারা যায় না।

জীবনানন্দকে বলা হচ্ছে জন্মান্তরবাদের কবি, তিমির বিলাসী কবি। কিন্তু তিনি তো সাস্ট করেই বলেছেন :

"এসো আমরা যে যার কাছে, যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে?
হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি
কোথাও সূর্যের ভোর রয়ে গেছে বলে মনে হয়।
মরণকে নয় শুধু
মরণ সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়ে
যা কিছু দেখার আছে
আমরাও দেখে গেছি।"

[সূর্য প্রতিম-'সাতটি' তারার তিমির']

এই কবির বিরুদ্ধে তিমির বিলাসের অভিযোগ কী করে ওঠে? তাঁর কবিতায় সুদূর অতীতের পরিপ্রেক্ষিত থাকলেও অনাগত সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নময় কল্পলোকও ছিল, তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন :

"আমরা অনেক যুগ ইতিহাসে সচকিত চোখ মেলে থেকে
দেখছি আসন্ন সূর্য আপনাকে বলয়িত করে নিতে জানে
নব নব মৃত সূর্যে শীতে
দেখেছি নির্ঝর নদী বালিয়াড়ি মরুর উঠানে
মরণেরই নামরূপ অবিরল কী যে।"

[অন্ধকার থেকে ' বেলা অবেলা কালবেলা']

বাংলাদেশের মৌলবাদীরা কোথায় নিয়ে যেতে চান জীবনানন্দকে, সাম্প্রদায়িকতার কোন্ নরকে। যতই তাঁকে জন্মান্তরবাদের কবি বলা হোক তাঁর কবিতা এক আশ্চর্য আশাবাদী দ্যোতনা নিয়ে জেগে ওঠে নবজীবন পিয়াসী মানুষের সাথে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছেন। তিনি তিমিরবিলাস নয় গেয়েছেন তিমির হননের গান।

"তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমির বিলাসী?

আমরা তো তিমির বিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।"

[তিমির হননের গান— 'সাতটি তারার তিমির']

যেখানে জীবনানন্দ সেখানেই তিমির হননের গান। তারার আলো, জীবনানন্দ এপার বাংলা-ওপার বাংলা, দুই বাংলার। তাঁর কবিতাকে যাঁরা ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চান তাঁরা বাংলাভাষীর কাছে জঞ্জাল স্বরূপ। জীবনানন্দ সব বাঙালির স্মরণীয় উত্তরাধিকার।

"স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালবেসে গেছি।"

আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব
স্মারক গ্রন্থ, নিউইয়র্ক
জুন, ২০০৯
(পরিমার্জিত)

বাংলাদেশ ও বাউল ভাস্কর্য

ভাস্কর্য নির্মাণ ইসলাম অনুমোদিত নয়। এই নিয়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে ২০০৮ সালের অক্টোবরে একটা ঝড় উঠেছিল। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যা জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্মরণে উৎসর্গীকৃত। তার সামনের গোল চত্বরে বাউল সম্রাট লালনকে স্মরণে রেখে নির্মীয়মান পঞ্চ-বাউলের ভাস্কর্য নিয়ে যে আন্দোলন-আন্দোলন খেলা হয়েছিল তা তো চুকে-বুকে গেছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। তাকে আবার টেনে আনছি কেন তা নিয়ে পাঠকদের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেই ঝড় থেমে গেলেও কিছু প্রশ্ন রেখে গেছে, যার মীমাংসা হয়নি। আমরা সেইসব প্রশ্ন নিয়ে কিছু আলোচনা করবো এখানে।

বাংলাদেশ সরকারের অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং সড়ক বিভাগের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভাস্কর মৃণাল হক, ৪৫ ফুট উঁচু 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' নামে এই ভাস্কর্যটি নির্মাণের মূল দায়িত্বে ছিলেন। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশমুখে সড়ক-দ্বীপে এটি স্থাপন করার সময় ধর্মান্ধ মৌলবাদী মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা প্রবলভাবে বাধা দেয় এবং যে মূল ভাস্কর্যটি বাইরে নির্মিত হয়েছিল, তা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে। এই বাধার মুখে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ভাস্কর্যটি অপসারণ করা হয়। মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সংগঠিত করেছিল খতমে নবুওয়ত আন্দোলন নামে একটি সংগঠন এবং তাদের সমর্থন দিয়েছিল ইসলামী ঐক্যজোট নামে একটি রাজনৈতিক দল। যে দল পূর্ববর্তী সরকারের কোয়ালিশন সহযোগী ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ভাস্কর্য নির্মাণের জন্যে বাংলাদেশ সরকারের কোনও অর্থ ব্যয় হচ্ছিল না। ভাস্কর মৃণাল হক লালন স্মরণে এই ভাস্কর্য নির্মাণের অর্থায়নের জন্যে নিজেই স্পনসর জোগাড় করেছিলেন। তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যে সরকার দায়িত্ব নিয়েছিল সেনাবাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতায়। সারা বিশ্ব জানত সে সময় বাংলাদেশ সরকারের মূল ক্ষমতা ছিল সেনাপ্রধানের হাতে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রে একটা সময়ে কেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এই ভাস্কর্য নির্মাণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অসামরিক বিমান চলাচল, পর্যটন এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টারা (ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায়) অনুমোদন দিয়েছিলেন। এই নির্মাণ কাজে প্রধান উপদেষ্টা (প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাপ্রাপ্ত) এবং সেনাপ্রধানেরও অনুমতি ছিল। তা না হলে এই ভাস্কর্যের পরিকল্পনা এবং নির্মাণকাজ আরম্ভ হত না।

বাংলাদেশে খুব বেশি না হলেও এর আগে ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী এবং খুলনার মত মহানগরের

গুরুত্বপূর্ণ সড়ক-দ্বীপে। সেসব নিয়ে ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলগুলি মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানালেও তাদের দাবিতে কোনও ভাস্কর্য অপসারণ করা হয়নি। তারাও ভাঙ্গার কোনও চেষ্টা করেনি। মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইস্যুতে ভাস্কর্য অপসারণ নিয়ে প্রতিশ্রুতি থাকলেও, ঐ পর্যন্তই। কিন্তু কখনো তা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যায়নি। কিন্তু ২০০৮-এর অক্টোবরের ঘটনা তা নয়, এর তাৎপর্য আলাদা। এখানে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি যেন প্রথম সাফল্যের স্বর্ণশিখর স্পর্শ করল। যাকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।

আমরা জানি ইসলামে মূর্তি-আরাধনা নিষিদ্ধ। এটা উপাসনা-পদ্ধতির একটা ধারা। যারা তা করেন তাদের পৌত্তলিক বলা যায়, কিন্তু ইসলাম তাদের বলে কাফের, যার অর্থ অত্যন্ত অবমাননাকর। পৃথিবীতে বিচিত্র সব ধর্ম আছে। রয়েছে বিচিত্র উপাসনা পদ্ধতিও। তা নিয়ে নানা বিরুদ্ধমত থাকতেই পারে, কিন্তু অন্য ধর্মকে নির্মূল করার ভাবনা আসুরিক। সেখানে কোনও শুভচেতনা নেই। মূর্তিপূজা নিয়ে ইসলাম যেভাবে বাড়াবাড়ি করে আজকের যুগের মানদণ্ডে তাকে বিচার করে দেখতে গেলে ইসলাম ধর্মের পালনীয় আচারের মধ্যেই অনেক বৈপরীত্য খুঁজে নেওয়া যায়। সে আলোচনায় পরে আসছি।

ইসলামে শুধু মূর্তি-পুজা নয়, মূর্তি-নির্মাণও নিষিদ্ধ। ইসলাম ভাস্কর্য আর মূর্তিকে আলাদা করে দেখে না। মূর্তি এবং ভাস্কর্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা শুধু দেখার নয়, ভাবনারও ব্যাপার। এই ব্যবধান বুঝতে না পারলে সব ভাস্কর্যকে মূর্তি বলে মনে হবে। ভাস্কর্য মূর্তি নয়। কিন্তু হলেই বা ক্ষতি কী ? তারও তো নান্দনিক দিক থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামে নন্দনতত্ত্ব বলে কিছু নেই। ইসলামে শিল্প-সংস্কৃতি, ভাস্কর্য, মূর্তি-শিল্প সব কিছু নিষিদ্ধ। ইসলামের যাঁরা আধুনিক ব্যাখ্যা দেন তাঁরা অবশ্য এত কিছু স্বীকার করেন না। মানব প্রকৃতির সৌন্দর্য চেতনার কোনও প্রাসঙ্গিকতা ইসলামী জীবনধারায় নেই। ইসলামে সব কিছুই পৌত্তলিকতা। আর পৌত্তলিকতাকে দুনিয়া থেকে মুক্ত করতেই ইসলামের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদের জন্ম। ইসলামে চিত্রকলাও নিষিদ্ধ ছিল। কারণ চিত্রকলাকেও নাকি পৌত্তলিকতা থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না। হযরত মোহাম্মদের ইন্তেকালের অনেক পরে ইসলামী চিত্রকলা সৃষ্টি হয়েছে। লতা-পাতা-ফুল (এদের প্রাণহীন বলেই মনে করে ইসলাম) নিয়ে যে চিত্রকলা তা অনেক ইসলামী ধর্মবেত্তা অনৈসলামিক বলে মনে করেন। তবে আরবী ভাষার (যা কোরানের ভাষা) বর্ণমালা নিয়ে দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy) সৃষ্টিও ইসলামী চিত্রকলার অঙ্গ। মুসলমানদের কাছে আরবী হল পবিত্র ভাষা, যে ভাষায় রসূলের কাছে আল্লাহ নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আরবী বর্ণমালাও তাই পবিত্র। এক বাঙালি কবির কাছে তো বাংলাভাষার বর্ণমালাকে পৌত্তলিকতার প্রতীক বলে মনে হয়েছিল। মানুষ-পশু-পাখী-নৈসর্গ ইসলামী চিত্রকলায় উঠে এসেছে অনেক পরে। তা নিয়ে অনেক বিতর্কও আছে। আমাদের তা আলোচনার বিষয় নয়।

ইসলামের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদের জীবনে মক্কা বিজয় ছিল চূড়ান্ত বিজয়। মক্কার কাবাগৃহ ছিল সেখানকার প্রধান গোত্র কোরেশদের উপাসনা কেন্দ্র। যেখানে উপাসনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসতেন সমগ্র আরব ভূমির মানুষ। কাবা ছিল তাদের তীর্থস্থল আর মক্কা তীর্থভূমি। তীর্থ'র ইসলামী পরিভাষাই হল হজ। হযরত মোহাম্মদ সেই হজের ঐতিহ্যই গ্রহণ করেছেন প্রাক-ইসলামী আরবদের কাছ থেকে কিছু আঙ্গিক

পরিবর্তন করে। মোহাম্মদ ছিলেন কোরেশ গোত্রের সন্তান। কাবাগৃহ অধিকার করার পর ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমেই মোহাম্মদ সেখানে রক্ষিত কোরেশদের উপাস্য ৩৬০টি মূর্তি নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলেন। তারপর আবৃত্তি করেন।

"বল সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবে।"
— কোরান, সূরা বনি ইসরাইল, ১৭/৮১

এইভাবে মোহাম্মদ পিতৃধর্ম ধ্বংস করেন। সেই থেকে কাবাশরীফ মুসলমানদের কাছে পবিত্রতম তীর্থ।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, পিতৃধর্মের উপাস্য মূর্তি ভেঙ্গে দিয়ে মোহাম্মদ কী শেষ পর্যন্ত ইসলামকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করতে পেরেছিলেন ? পৌত্তলিকতার অর্থ তো শুধু মূর্তি উপাসনা নয়, যে কোনও জড় পদার্থকে ভিন্নভাবে শ্রদ্ধা জানানোও পৌত্তলিকতা। ইসলাম ধর্মানুসারীরা কোনও দিন পৌত্তলিকতার মর্মার্থ সঠিকভাবে বুঝতে চান না। মোহাম্মদ কাবায় মর্যাদার সাথে রক্ষিত পিতৃধর্মের সব মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেললেন কিন্তু রেখে দিলেন কৃষ্ণ পাথর (Black Stone), যাকে বলা হয় হজর-ই-আসওয়াদ (Hazr-e-Aswad), যে কৃষ্ণ পাথরটির ওপর কাবার সব চাইতে বড় দেবতার মূর্তিটি স্থাপিত ছিল। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন এই কৃষ্ণ পাথর আল্লাহ বেহেশত থেকে বিতাড়িত আদি মানব হজরত আদমকে দান করেছিলেন। বিমূর্ত পাথরের কোনও সুনির্দিষ্ট অবয়ব না থাকলেও তাকে মূর্তি থেকে আলাদা করা যায় না। কাবায় হজ পালনরত মুসলমানরা সকলেই পৌত্তলিক কোরেশদের, ইসলামের ভাষায় যারা কাফের, তাদের প্রধান দেবতার বেদীতে, যে কৃষ্ণ প্রস্তরকে পবিত্র করে গেছেন আল্লাহর নবী সেই আসওয়াদে চুম্বন করে ধন্য হন। এই চুম্বন আরবিয় সংস্কৃতি-জাত, যেমন প্রণাম ভারতীয় সংস্কৃতি। এখানে চুম্বন আর প্রণামের মধ্যে শ্রদ্ধাগত কোনও পার্থক্য নেই। শুধু তাই নয়, লন্ডন প্রবাসী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী জানাচ্ছেন, কাবাগৃহের ভিতরে রাখা আছে আরও একটি পাথর, যার ওপর অঙ্কিত রয়েছে একটি পায়ের ছাপ। মুসলমানদের বিশ্বাস এটি ইসলামের আরেক নবী হজরত ইব্রাহিমের পায়ের ছাপ। তিনি কাবাগৃহ নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানে সারাদিন একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতেন, সেই পায়ের ছাপ পাথরে রয়ে গেছে। হজের সময় মুসলমানরা এই পাথরেও চুম্বন করেন। এইসব চুম্বনের মধ্যেই রয়েছে হজের পরিপূর্ণতা (দৈনিক স্টেটসম্যান, কলকাতা, ২৬ অক্টোবর, ২০০৮)। হজরত ইব্রাহিমের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু তাঁকেও যে বিধর্মীর উপাস্য দেবমূর্তি ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ। মোহাম্মদের কাছে তা পুনরুচ্চারিত হয়েছে কোরানে :

"শপথ আল্লাহর, তোমরা চলে গেলে তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।
অতঃপর সে ওদের প্রধানটি ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল।"
— কোরান, সূরা আম্বীয়া, ২১/৫৭-৫৮

এই প্রধান দেবতাটি কে, কেন তাঁর মূর্তি ভাঙ্গতে পারলেন না আল্লাহর নবী ইব্রাহিম?—তা আমাদের জানা নেই। যে নবী প্রথম কাফেরদের উপাস্য দেবতার মূর্তি ভাঙ্গলেন তাঁর কল্পিত চরণচিহ্নে এখন চুম্বন করেন তাঁর অনুসারীরা। পদচিহ্নের এই উত্তরণও কী পৌত্তলিকতা নয় ?

বিধর্মীদের উপাস্য দেবমূর্তি হোক কিংবা বিমূর্ত কোনও ভাস্কর্য হোক তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে, আল্লাহ এবং রসূলের তাই নির্দেশ। সেই নির্দেশ থেকে কোনও মুসলমান দূরে সরে যেতে পারেন না। তাদের কাছে মূর্তি আর ভাস্কর্য আলাদা নয়। মক্কা বিজয়ের পর থেকেই মুসলমানদের মূর্তি ভাঙ্গার ইতিহাসের শুরু। সেটা যেন তাদের কাছে গৌরবের উত্তরাধিকার। যে সব দেশে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছে বা যারা স্বেচ্ছায় ইসলামকে গ্রহণ করেছেন (ব্যতিক্রম অনেক পরের ঘটনা), সেখানে মুসলমানরা পরধর্মের কত যে মূর্তি ও ভাস্কর্য নষ্ট করেছেন তা সঠিকভাবে ইসলামের ইতিহাসে চিহ্নিতও নেই। বহুযুগের ইসলামি শাসনে সব চাপা পড়ে গেছে, কিছু কিছু ঐতিহাসিক কিছু উদ্ধার করেছেন, সব পারেন নি। সভ্যতার ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য, অনেক সভ্যতার পরিচয় চিহ্ন সেসব। সেই শিল্পকে ধ্বংস করার অর্থ সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা, মানব সভ্যতাকে দরিদ্র করা। সেই কাজই করেছেন মৌলবাদী ইসলামের নিশানবরদাররা। বেশি দিনের ঘটনা নয়, আমরা মনে করতে পারি তালিবানদের কীর্তি। ইসলাম- পূর্ব যুগে একসময় আফগানিস্তান ছিল বৌদ্ধ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান। সেখানকার বামিয়াম পাহাড় খোদাই করে পৃথিবীর দুটি সর্বোচ্চ ও সুন্দরতম বুদ্ধমূর্তি (১৭৫ ফুট ও ১২০ ফুট উচ্চ) নির্মাণ করেছিলেন কুষাণ যুগের ভাস্কর ও শিল্পীরা। পৃথিবীর শিল্প ও সভ্যতার ইতিহাসে যে ভাস্কর্যের কোনও তুলনা ছিল না। আফগানিস্তানে চরম মৌলবাদী তালিবান শাসকেরা আল্লাহর নির্দেশেই নাকি সেই অতুলনীয় ভাস্কর্য ধ্বংস করে। সারা বিশ্ব তালিবানদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল সেই তুলনাহীন সৃষ্টিকে ধ্বংস না করে সভ্যতার সম্পদকে রক্ষা করার। সারা বিশ্বের জাতি-ধর্ম সব দেশ নির্বিশেষে তালিবানদের নিন্দায় মুখর হলেও মুসলিম জাহানের কোনও দেশ সরকারিভাবে তালিবানদের নিন্দা করেনি। শুধু বামিয়ামের ধ্বংসলীলা নয়, কাবুল জাদুঘরে যেসব প্রাচীন মূর্তি ও ভাস্কর্য যত্নের সাথে রক্ষিত ছিল তাও ধ্বংস করেছে তালিবানরা, যা আর কোনওদিন দেখা যাবে না। এই হলো মৌলবাদী ইসলামের আসল চেহারা। আফগানিস্তানে তালিবানদের পতন হয়েছে। কিন্তু তারা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন মুসলিম দেশে। অমুসলিম দেশেও তারা ছোবল মারছে। তারা দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন ফিরিয়ে আনতে চায়। মুসলমানদের মুক্ত করতে চায় কাফেরদের শাসন থেকে।

বাংলাদেশের প্রধান বিমান বন্দরের প্রবেশমুখে নির্মীয়মান বাউল ভাস্কর্য অপসারণ প্রসঙ্গে এত কথা বলে নিলাম বলে আশা করি সহৃদয় পাঠক ক্ষুণ্ন হবেন না। আমরা আবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ফিরে যাই। ঢাকাতে সেই বাউল ভাস্কর্য অপসারণের দাবিতে ইসলামি মৌলবাদীরা যে আন্দোলন করে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রশাসন তা মেনে নেয়। মৌলবাদী 'বিপ্লবীদের যুক্তি ছিল ঢাকা বিমানবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের হজযাত্রীরা সৌদি আরবের জেদ্দার পথে হজ করতে যান। যাত্রার মুখে তাঁরা ইসলাম বিরোধী কোনও মূর্তি দর্শন করতে পারেন না। তাতে তাঁদের হজযাত্রার পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে। আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছেন (যাঁর কথা আগেই উল্লেখ করেছি), 'এই ভাস্কর্যের কোনও ধর্ম ছিল না। বাঙালির লোকায়ত শিল্পের হাজার বছরের প্রতীক, দৃষ্টিনন্দন একটি ভাস্কর্য দেখে একজন বাঙালি মুসলমানের হজযাত্রা যদি বিঘ্নিত হয় তাহলে হজযাত্রার দিনে ঘুম থেকে উঠে প্রকৃতির শোভা ফুল-পাখি দেখলে বা পাখির গান শুনলেও তার পবিত্রতা নষ্ট হবে। তাহলে তো বাংলাদেশ থেকে সব ফুল, পাখি তাড়াতে হয়। পাখির গানও বন্ধ করে দিতে হয়।'

ঢাকা বিমানবন্দরের প্রবেশমুখে সড়ক-দ্বীপে বাউল ভাস্কর্য অপসারণের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন যে ইসলামি সংগঠন তার ব্যানারে নাম ছিল 'ঢাকা বিমানবন্দর গোলচত্বর মূর্তি প্রতিরোধ কমিটি'। তারা নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবি করেছিল। কিন্তু তাদের সমর্থন করেছিল অনেক ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি'। তাদের কণ্ঠেই এর আগে বিভিন্ন সময়ে শোনা গেছে এই শ্লোগান— 'আমরা হব তালিবান, বাংলা হবে আফগান।' তবে 'হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ'-এর আলেম সমাজ এই ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করেননি। তাঁরা মনে করেন মূর্তি ও ভাস্কর্য এক জিনিস নয়। ভাস্কর্য ভাঙ্গা অপরাধ। বাংলার লোকজ সংস্কৃতির অঙ্গ ভাস্কর্য ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। হাক্কানী মিশন ইসলামের যে উদার ব্যাখ্যা দেন তা নিয়ে ভিন্নমত আছে। আমরা সেই আলোচনায় যাব না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সব চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ, শিল্পী নাট্যকর্মী, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিসেবীদের নিয়ে গঠিত যে নাগরিক সমাজ এবং সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেভাবে বাউল ভাস্কর্য অপসারণে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার গুরুত্বই দেননি। কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দল বলে পরিচয়দানকারী কারো কাছ থেকে কোনও প্রতিবাদ পাওয়া যায় নি, কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদও কিছু বলেন নি। এই হলো বাংলাদেশের রাজনীতির বাস্তব চিত্র। তখন অবশ্য একটা কারণ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, ঠিক দু'মাস পরে ছিল জাতীয় সংসদের নির্বাচন। ক্ষমতায় যাওয়ার হাতছানি। বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের সচেতন দৃষ্টি ছিল তখন দেশের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর দিকে, তারা কী ভাবছেন সে ভাবনায় তারা আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজের সেই প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা সেসময় যে দায়িত্ব পালন করেছেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থান পাবে। বাংলাদেশে যেমন মৌলবাদীরা আছেন, এঁরাও আছেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা বড় কম। এঁরা বাংলাদেশের বিপুল জনসমষ্টিতে একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, তা না হলে লালনের স্মরণে নির্মাণের শেষ পর্যায়ে সেই একতারা হাতে বাউল ভাস্কর্য অপসারণ করা সম্ভব হতো না। নাগরিক সমাজ সেই সড়ক-দ্বীপের নামকরণ করেছেন 'লালন চত্বর'। কিন্তু বাংলাদেশে লালন ফকির মৌলবাদীদের কাছে শ্রদ্ধেয় নন। লালনের জীবন ও গান নিয়ে বাংলাদেশে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। কিন্তু তিনি এখনো সেখানে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত নন। মৌলবাদী অধ্যাপক আবু জাফর লালনকে বলেছেন ইসলামের শত্রু। মুসলমানদের ইমান-বিধ্বংসী একজন জঘন্য মহানায়ক। লালন কোরাণে বেদে কোনও প্রভেদ করেন না। নামাজ-রোজাকে ব্যাখ্যা করেন ভিন্নভাবে, মানেন ধর্মের বেড়া। তাঁকে কী করে মৌলবাদী মুসলমানরা বুঝতে পারবেন ?

"বেদ পুরাণে করেছে জারী
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
আমি তা বুঝতে নারি
দুইরূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ ?"

এই প্রশ্নের উত্তর কী মৌলবাদী মুসলমানরা দিতে পারবেন ? লালনের কাল (১৭৭৪-১৮৯০ খ্রিঃ) চলে গেছে। মাঝখানে আরও এক শতাব্দী। গানের ভিতর দিয়ে

যে অটল ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্যানধারণা তিনি রেখে গেছেন মৌলবাদ তাকে কোনওদিন স্পর্শ করতে পারবে না। লালন যখন বলেন :

"যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয়
রাম-রহিম করিম-কালা এক আত্মা জগৎময়।"

এই গানকে বুঝতে চাইবেন এমন মানুষকে ইসলাম স্বীকারই করে না। বাউল সাধনার ভিতর দিয়ে জীবনের যে অনুসন্ধান তা ইসলাম অনুমোদন করে না। লালন যখন বলেন :

"পড়বা নামাজ জেনেশুনে।"

তখন অধ্যাপক আবু জাফরদের কাছে তা মনে হয় "নামাজ থেকে মুসলমানদের দূরে রাখার অপূর্ণ ইবলিসী কৌশল।"

বাংলাদেশের মৌলবাদী মুসলমানরা আবহমান বাংলার সংস্কৃতি এবং লোকজ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে চান না। যেটুকুও বা ঢুকে গেছে তাও বর্জন করতে চান এখন। তারা ফিরে যেতে চান একেবারে ইসলামের উৎসে—কোরানের শাসনে। তবুও রসূল মোহাম্মদ কিছু আপোস করেছিলেন বলে মনে হয় যে কোনও কারণে। কাবা শরীফের ভিতরের ৩৬০টি মূর্তি ভাঙ্গার পর তিনি দেওয়ালের সব ফ্রেসকো নষ্ট করার নির্দেশ দেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ে কাবার মাঝখানের একটি স্তম্ভে। সেখানে বাইজেনস্টাইন যুগের যীশুখ্রিস্ট জননী মেরী মাতার একটি অপূর্ব ছবি আঁকা ছিল, তিনি ছবিটির ওপর হাত রাখেন এবং সেটি নষ্ট করতে নিষেধ করেন। নবী মোহাম্মদের ইন্তেকালের পরও ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে (৬৩২-৬৬১ খ্রিঃ) কাবা শরীফে সেই ছবি ছিল তারপরেও দুই দশক। এই তথ্য রয়েছে মোহাম্মদের প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাকের লেখা "Life of Muhammad" গ্রন্থে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ এই তথ্য উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন নবী মোহাম্মদ 'কাজটি করেছেন সৌন্দর্যের প্রতি গভীর মমতা থেকে।' আমাদের তা মনে হয়নি। ছবিটি মেরী মাতার না হলে তার কোনও সৌন্দর্যই নবীকে আকর্ষণ করত না। ছবিটি পরে কার নির্দেশে কেনই বা নষ্ট করা হল তা জানা যায়নি। আধুনিক উদারনৈতিক মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা যে 'পলিটিক্যাল ইসলাম'-এর কথা বলেন এখানে আমরা যেন তাই খুঁজে পাচ্ছি। এই আলোচনা আমরা এখানে করতে চাই না।

ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে মুসলমানদের জন্যে নিজস্ব ভূমি পাকিস্তানের সৃষ্টি। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ। তার সৃষ্টির ইতিহাস ও জন্মকালীন আদর্শের কথা এখানে তুলছি না। সেসব থেকে বাংলাদেশ এখন অনেক দূরে। এখন বাংলাদেশে ইসলামের মৌল আদর্শে ফিরে যাওয়ার উন্মাদনা। দেশের বিদ্বৎজনরা দেশকে যেভাবে দেখতে চান তা আর সম্ভব বলে মনে হয় না। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশ তাদের ইসলাম-পূর্ব ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু করেছে যে এমন ব্যতিক্রমও রয়েছে, তেমন কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি ইন্দোনেশিয়া। সেই দেশের মুসলমানরা 'রামায়ণকে তাদের জাতীয় গ্রন্থ বলে মনে করে। তাদের জাতীয় বিমান সংস্থার নাম

'গরুড়'। এখনো সেই দেশের অধিকাংশ লোকের নামের উৎস ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত। তাতে তাদের মুসলমানত্ব খর্ব হয়েছে বলে কেউ মনে করে না। মিশর আরেকটি আরব মুসলিম দেশ। সেই দেশেই জন্ম ইসলামি ব্রাডারহুডের। যাদের শ্লোগান হল— "Allah is our God, The Prophet is our Leader, The Koran is our Constitution." তাবপরও মিশরের যা কিছু অহঙ্কার প্রাক ইসলামি ফেরাওনদের পৌত্তলিক সভ্যতা নিয়ে, বিশ্বে মিশরের পরিচয় পিরামিড, মমি আর ফেরাওনদের দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে। কিছুই তারা নষ্ট করে নি, নষ্ট হতে দেয় নি। মিশরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত ইসলামি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই পৌত্তলিকতা বর্জন করার জন্যে কোনও ফতোয়া দেওয়া হয় নি। মিশরের জাতীয় পরিচয় এখন পৌত্তলিক সভ্যতার পিরামিডের দেশ বলে।

ইরান (পূর্ব নাম পারস্য) একটি ঘোষিত ইসলামী রাষ্ট্র এবং মৌলবাদী দেশ। যে দেশ পরিচালিত হচ্ছে আয়াতুল্লাহদের অনুশাসনে। সেখানে জাতীয় উৎসব রূপে 'নওরোজ' পালন বন্ধ করে দেওয়া হয়নি, যা ছিল অগ্নিপূজারীদের উৎসব। ইরান ইসলামকে 'বিশুদ্ধ' করে নিয়েও প্রাক-ইসলামী যুগের অগ্নিপূজারীদের ঐতিহ্যকে বর্জন করে নি। অগ্নিপূজারী হাতেম তাই, সোহরাব, রুস্তম এখনো ইরানে জাতীয় বীরের মর্যাদা পান। ক'জন জানেন এরা মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন জরথ্রুষ্টবাদী। মহাকবি ফেরদৌস (৯৩৪-১০২০ খ্রিঃ) বিশ্বনন্দিত মহাকাব্য 'শাহনামা' যাকে বলা হয় Epic of Kings, যার প্রধান চরিত্র সোহরাব ও রুস্তম। অগ্নিপূজারীদের বীরগাথা বলে মৌলবাদী ইরান শাহনামার উত্তরাধিকার থেকে দেশকে বঞ্চিত করে নি। লেখক হুমায়ুন আহমেদ আরো কিছু তথ্য জানিয়েছেন ইরানের, ঢাকা বিমানবন্দরের ভাস্কর্য অপসারণ প্রতিবাদী বক্তব্যে। শেখ সাদী ইরানের অবিস্মরণীয় কবি। তাঁর রচিত নাত-এ-রসূল মুসলমানরা পাঠ করেন মিলাদ মাহফিলে :

"বালাগল উলাবি কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি
হাসানত জামিও খেসালিহি
সাল্লুআলাহি ওয়ালিহি..."

সেই মরমী কবি শেখ সাদীর মাজারের সামনে একটি পাথরের মর্মর ভাস্কর্য রয়েছে। ইসলামের দুজন সুফী সাধক যাঁরা বাস করতেন পারস্যে, তাঁদের একজনের নাম জালালউদ্দিন রুমী, অন্যজন ফরিদউদ্দিন আত্তার। তাঁদের মাজারের সামনে আবক্ষ মূর্তি আছে। বর্তমান ইরানের মৌলবাদী রাজনীতিবিদরা, মাদ্রাসার ছাত্ররা সেইসব ভাস্কর্য বা মূর্তি ভাঙ্গার কোনও চেষ্টা করেছে বলে কোনওদিন শোনা যায় নি। কট্টর ইসলামী মৌলবাদী দেশের আরেকটি হল লিবিয়া—যার রাজধানী ত্রিপোলিতে বিশাল একটি মসজিদ আছে। মসজিদের সামনে গ্রীকদের তৈরী একটি মূর্তি স্বমহিমায় এখনো বিরাজমান। ইসলাম গ্রহণ করার আগে লিবিয়ায় গ্রীকদের আধিপত্য ছিল। ইসলামী লিবিয়া বিধর্মীদের অনেক ঐতিহ্যই সংরক্ষণ করেছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা বা মওলানারা পৌত্তলিকতার প্রতীক সেই মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলে নি। কোনও আন্দোলনেও নেমেছে বলে জানা যায় নি।

ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মিশর বা লিবিয়ার প্রাক ইসলামী যুগের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার নিয়ে যে সচেতনতা, যা মৌল ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয় বরঞ্চ অপরাধ, তারা সেসব ধারণ করে আছে কীভাবে ? এই প্রশ্নের একটাই উত্তর হতে পারে সেসব দেশের মুসলমানদের স্বদেশের অতীত ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের প্রতি গভীর প্রেম, যা তাদের দেশপ্রেমের অঙ্গ। বাংলাদেশের মুসলমানরা (সারা ভারত উপমহাদেশের ক্ষেত্রেই একথা বলা যায়) কী ভাবতে পারেন ভারতের—বাংলার পুরাণ সাহিত্য, মহাকাব্য, প্রাচীন ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলাকে নিজেদের উত্তরাধিকারের অংশ বলে ? বাংলাদেশের ভূমিতে ইসলামের আগমনের পূর্বের যা কিছু মহৎ এবং সুন্দর তাতে তাঁদেরও অধিকার রয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা কখনো সেই সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সৌন্দর্যচেতনাকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেন নি। যা কিছুতে ইসলামের সীলমোহর নেই তা কাফেরদের, তাদের সেদিকে তাকাতে নেই তা ইসলাম বিরোধী বলে। স্বয়ং রসূল মোহাম্মদ কোনও কোনও জায়গায় ছাড় দিলেও বাংলাদেশের মৌলবাদী মুসলমানরা যেন তাও মেনে নিতে রাজী নন। মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করলে সেখানে নামাজ পড়া নাজায়েজ নয়, বরঞ্চ মহাপুণ্যের কাজ। কিন্তু জাতীয় সম্পদ হিসাবে কোনও প্রাচীন মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করার উদ্যোগ নিলে (যেমন রমনা কালীমন্দির) তার বিরুদ্ধে তারা আওয়াজ তোলেন। ঢাকা বিমানবন্দরের প্রবেশমুখে পঞ্চবাউল ভাস্কর্য অপসারণে সাফল্য পেয়ে মৌলবাদী মুসলমানরা দাবি তুলেছেন সেখানে হজ মিনার নির্মাণ করতে হবে। ইসলামে মসজিদ কেন্দ্রিক স্থাপত্য নিষিদ্ধ নয়, কারণ স্থাপত্যের প্রাণ নেই। কোনওরূপ প্রাণের প্রতিরূপও তাতে থাকে না। তাই মুসলিম জাহানে মসজিদের গম্বুজ ও মিনারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী স্থাপত্য।

বাংলাদেশের ঢাকা বিমানবন্দরের প্রবেশমুখ থেকে বাউল ভাস্কর্য অপসারণ নিয়ে অনেক কথা বলতে হলো আমাদের। তার কারণ এই পরিপ্রেক্ষিতে জানা না থাকলে প্রসঙ্গটিকে সামগ্রিকভাবে বোঝা যাবে না। বাউল ভাস্কর্য অপসারণ আন্দোলন যে শুধুমাত্র মৌলবাদী মাদ্রাসার ছাত্র এবং মোল্লামৌলবীদের ইসলামের প্রতি গভীর প্রেম থেকে এসেছে এতটা সরল তা নয়। এর পিছনে রাজনীতিও আছে। অনেকে আবার এর মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের সন্ধানও পেয়েছেন। আমরা সেই রহস্যের সন্ধান জানতে পারবো না। কিন্তু তার পিছনে যে রাজনীতি ছিল, সে সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারছি না। তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যে সরকার আবার সেনাবাহিনী সমর্থিত, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। জনগণের কাছে রাজনীতির কাছে তাদের সরাসরি কোনও জবাবদিহি করার ছিল না, কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তারা যখন ঢাকা বিমানবন্দরের প্রবেশ মুখে বাউল ভাস্কর্য নির্মাণের মতো একটি মহৎ এবং নান্দনিক উদ্যোগ নিলেন তখন কী কিছুই ভেবে দেখেন নি ? তাহলে মৌলবাদী আস্ফালনের কাছে পরাজিত হলেন কেন ? সেটা কী তাদের স্বেচ্ছা পরাজয় ছিল ? তাদের প্রতি তো সমর্থন ছিল সব প্রগতিশীল সংগঠন, বিদ্বৎসমাজ, সৌন্দর্যপিয়াসী সব শিল্পী এবং সংস্কৃতিসেবীরা, এমন কী প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকাও। এই সুশীল সমাজ তুচ্ছ হয়ে গেলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে। তাদের তো সেনাসমর্থনও ছিল। তাহলে কী ধরে নেব মৌলবাদীদের প্রতিবাদের মুখে সেনাবাহিনী শেষের দিকে চাপ দিয়েছিল বাউল ভাস্কর্য অপসারণে ? রহস্য কী সেখানে। দুই মাস পরেই ছিল জাতীয় নির্বাচন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা

হস্তান্তরের পালা, সব জেনে বুঝেই যেন এরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। যাচাই করে নেওয়া হচ্ছিল মৌলবাদীদের শক্তি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান। বাংলাদেশের ২০০৭-২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধান সমর্থিত সরকার ছিল না, কিন্তু সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকার ছিল। সেখানেই ছিল সেই সরকারের শক্তির উৎস। সেনাবাহিনীর প্রধান চাইলে নিজেই ক্ষমতা দখল করতে পারতেন। হতে পারতেন বাংলাদেশের তৃতীয় জেনারেল রাষ্ট্রপতি। কেন তিনি তা করলেন না, সে কী আন্তর্জাতিক চাপ, না সেনাবাহিনীতে অন্তর্কলহ না অন্য কিছু—তা আমাদের জানা নেই। এখানে বিশ্লেষণ করার সুযোগও নেই। বাংলাদেশের নগরে-বন্দরে আরো ভাস্কর্য রয়েছে, সেগুলি অপসারণের দাবিও বার বার উঠেছে মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে। কিন্তু কোনওটাই তুলে নেওয়া হয় নি। যত্নের সাথেই সেইসব সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মৌলবাদী রাজনৈতিক দল যখন সরকারের অংশ ছিল তখনো কোনও ভাস্কর্য ভেঙ্গে ফেলা হয় নি। যে আন্দোলন সহজেই দমন করা যেতো, তা না করে বাংলাদেশের সেই সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশমুখের সড়ক-দ্বীপ থেকে বাউল ভাস্কর্য সরাতে গেলেন কেন? কাদের পক্ষে তারা কাজ করে গেলেন ? এটা কী ছিল তাদের একটা পরিকল্পিত পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা ? হয়তো তাই।

বাউল ভাস্কর্য তার পূর্বের জায়গায় আর কোনদিন ফিরে আসবে না। বর্তমান সরকার যতই সংসদে তিন-চতুর্থাংশ আসনে অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক তারা কোনও উদ্যোগ নেবে না। বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ বিমানবন্দরের সড়ক-দ্বীপের নামকরণ করেছেন 'লালন চত্বর'। লালনকে আর সেখানে ফিরতে দেওয়া হবে না। এই নামকরণও সরকারী স্বীকৃতি পাবে না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হজ-প্রীতির কথা সকলের জানা আছে। রাজনীতিতে আসার পর তিনি যে কতবার হজ এবং ওমরাহ হজ পালন করেছেন তার হিসাব কার কাছে পাওয়া যাবে জানি না। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জীবনে কতবার হজের প্রয়োজন হয় তা আমাদের জানা নেই, তাই 'লালন চত্বরে'ই একদিন নির্মিত হবে বাংলাদেশের হজযাত্রীদের সম্মানে 'হজ-মিনার' বা তেমন কিছু স্মারক যা মৌল ইসলাম অনুমোদন করে, যাতে হজে পারুক বা না পারুক খুশী হয় বাংলাদেশের মৌলবাদী ইসলামী শক্তি। হজযাত্রার মুখে যাত্রীদের পুণ্যদর্শন হলে যে তাদেরও পুণ্য। বাংলাদেশের যা কিছু ধর্মের উর্ধে, সুন্দর, গীতিময় তা নষ্ট করে ফেলা হবে, এটাই হলো বাংলাদেশের বরিশালের কবি জীবনানন্দের ভাষায়—"অদ্ভুত আঁধার এক আসিয়াছে নেমে।" এবং তা বাংলাদেশেই।

ফলা, কলকাতা
অক্টোবর, ২০০৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ,
অক্টোবর, ২০০৮

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥"

রবীন্দ্রনাথের এই গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। বাংলাদেশের ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ গৃহীত মূল সংবিধানে জাতীয় সংগীতের কথা উল্লেখ করা আছে। সেই ধারা এখনো অপরিবর্তিত। পৃথিবীর সব দেশে জাতীয় সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, যা জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সংবিধানের অনেক ধারার সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করা গেলেও সংবিধানের মূলনীতি, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমতুল্য অপরাধ। সংবিধান নাগরিক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করলেও, তারও সীমারেখা নির্ধারিত করে দেওয়া আছে। কারণ বাক-স্বাধীনতা বা লেখার স্বাধীনতা কখনো নিঃশর্ত ব্যাপার নয়। এ সম্পর্কে বাক-স্বাধীনতার দেশ ইংল্যান্ডেও বলা হয়—"With the write to free speech goes one's obligation to be truthful and responsible—Rights and previleges do not have a free hand." [বাক-স্বাধীনতার সঙ্গে সত্যপরায়ণতা ও দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা জড়িত। যা কিছু বলার সুযোগ তাতে নেই।]

কিন্তু বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ। সে দেশে যে-কোনো লোক যখন তখন জাতীয় সংগীতের অবমাননা করতে পারে। বিকৃত মতপ্রকাশ করে তার পরিবর্তন চাইতে পারে। তার কোনো শাস্তি হয় না। দেশের কোনো কোনো সরকার বরঞ্চ তাতে যেন উৎসাহ

প্রদান করে গেছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক তার অপরাধ হল এই সংগীতের স্রষ্টা একজন অমুসলমান। অতৌহিতবাদী কবির রচিত গান মুসলিম বাংলার জাতীয় সংগীত হতে পারে না। হলেনই-বা সে-কবি সব ধর্মের ঊর্ধ্বে বিশ্বকবি। এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের উপলব্ধি তুলে ধরছি। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কিছু পরে ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালে গুণগ্রাহী কোনো ইংরেজ মহিলাকে তিনি লেখেন—"I dont belong to any religious sect nor to subscribe to any particular creed. That I know that the moment my God has created me he has made himself mine." [হায়াৎ মামুদ, 'দিন যাপনের ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্ধৃতি, পৃ. ১৩।] পৃথিবীর আর কোনো কাব্য-মনীষীর কণ্ঠে কি এ ধরনের কোনো উচ্চারণ আমরা শুনেছি? বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় নেই।

বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এই সংগীত ছিল জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। বাংলাদেশের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে ছিল এই গান। মুক্তিযুদ্ধের আগে ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের এই গান পাকিস্তান অধিকৃত বাংলাদেশে সকলের জন্যে ছিল প্রেরণার উৎস। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে (চুয়াডাঙার বৈদ্যনাথতলা) শপথগ্রহণকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটির প্রথম এগারো লাইনকে জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করা হয়, যা পরবর্তীতে ১৯৭২-এর সংবিধানে স্থায়ী মর্যাদা পায়।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। প্রথমে শেখ মুজিবের সহকর্মী খোন্দকার মুশতাক আহমেদকে সামনে রেখে সেনাবাহিনীর একটা অংশ ক্ষমতা দখল করলেও, কিছুদিন পর ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর তথাকথিত আর-এক সেনা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন সেনাপতি জিয়াউর রহমান। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের মূল মূল্যবোধের পরিবর্তনের কাজ।

জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের প্রথম দাবি উঠেছিল ৭ মার্চ ১৯৭৬ সালে। ঠিক পাঁচ বছর আগে যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (পূর্বের রেসকোর্স ময়দান) থেকে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" দেশে তখন সামরিক আইন। সভা-সমিতি-সম্মেলন সব নিষিদ্ধ। কিন্তু সোহরওয়ার্দী উদ্যানে রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর উদ্যোগে সিরাতুন্নবী সম্মেলনে কোনো বাধা নেই। বিশাল জনতা। যে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল তারাই সংগঠিত করেছিল সেই ইসলামী সম্মেলন। সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান ও লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত। প্রধান অতিথি ছিলেন জেনারেল জিয়ার সহকর্মী বিমানবাহিনীর প্রধান এবং উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এম. জি. তাওয়াব। সেই সিরাত সম্মেলন থেকেই দাবি ওঠে দেশের নাম, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত

পরিবর্তনের। বিস্তারিত বিশ্লেষণের সুযোগ এখানে নেই। সংবিধান কিন্তু তখনো বলবৎ ছিল। তাকে বাতিল কিংবা স্থগিত রাখা ছিল না।

যে জাতীয় সংগীত ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অর্জন, তা নিয়ে প্রথম বিতর্ক সৃষ্টি করে সামরিক প্রশাসন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী আবু জাফর শামসুদ্দিন বলেছিলেন, "স্বাধীনতার যুদ্ধকালে যে সংগীতটি ছিল আমাদের প্রেরণা, সেটাই করেছে আমাদের জাতীয় সংগীত।" ['রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭] জিয়াউর রহমান জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের প্রথম উদ্যোগ নেন। ১৯৭৮ এ রচিত হয় নতুন জাতীয় সংগীত যার প্রথম কলি ছিল 'আজাদ বাংলাদেশ'। এই নতুন জাতীয় সংগীতে সুর সংযোজনের জন্যে পাকিস্তান থেকে আনা হয়েছিল মেহেদি হাসানকে। তিনি আমলাতন্ত্রের সাহায্যে এই পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। (এই তথ্য প্রকাশ করেছিল খুলনার তৎকালীন জেলা প্রশাসক ইফতিখার আহমদ, ১৯৯৭ সালের ১৬ মার্চ বিজয় দিবস পালনের অনুষ্ঠানে, ঘটনার দুই দশক পরে লক্ষণীয় সেই সময় ক্ষমতায় ছিলেন শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা) কিন্তু জেনারেল জিয়াকে সরকারি কর্মচারীরা সমর্থন দেননি। তিনি তাদের কথা শুনে সামরিক ফরমান জারি করে, যেভাবে তিনি সংবিধানের মূল নীতি পরিবর্তন করেছিলেন, 'আমার সোনার বাংলাকে নির্বাসন দিয়ে 'আজাদ বাংলাদেশকে বসিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। জিয়া জামাতে ইসলামীর জন্যে রাজনীতির রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলে সেই সময় যাতে তাদের ভাবমূর্তি বেশি বেড়ে না যায় সেই ব্যাপারে সচেতন হলেন। সামরিক উর্দি পরেই তিনি তখন রাজনীতিতে নেমেছেন। রাষ্ট্রপতি পদেও নিজেকে অভিষিক্ত করেছেন। সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে গণতন্ত্রের প্রহসনও চালু করে দিয়েছেন। জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলাকে পরিবর্তন না করলেও তাকে মেঘের আড়ালে ঢেকে দিলেন। সামরিক বাহিনীতে থেকেই তিনি গঠন করেন নিজস্ব রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। যা বিএনপি নামেই বেশি পরিচিত। সেই দলের দলীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করা হল, যার প্রথম কলি :

"প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।"

তিনি এই সংগীতকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় উন্নীত করলেন কোনো আদেশ জারি না করেও, সব সরকারি অনুষ্ঠানে, বিদেশে কূটনৈতিক মিশনে, বিভিন্ন দেশে প্রেরিত শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া সংক্রান্ত সব সরকারি প্রতিনিধিদলের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে এই সংগীত গাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। জাতীয় সংগীত নয়। সাংবিধানিকভাবে জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করা হল না। কিন্তু তার অবমূল্যায়ন করা হল।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদুল হক বলেছেন : "রক্ত দিয়ে সত্য করা বাংলাকে সকল সমর্পণ, জাতীয়তার সংগঠক সেই পরশমণিটিকে জাতীয় ঐক্য বিনির্মাণ ও ত্যাগভিত্তিক কর্মযজ্ঞের আবাহনী কার্যে প্রয়োগ না করে তার

জায়গায় পিছন দরজা দিয়ে 'প্রথম বাংলাদেশ শেষ বাংলাদেশ' জাতীয় অপমানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে চালু করবার মতো অবমাননা ফরমায়েশি সংস্কৃতির কুণ্ঠাহীন অবতার মোনেম খাঁকে দিয়েও কল্পনা করা যায় না।" ('ফরমায়েশী সংস্কৃতি—সংগীত সংস্কৃতি', জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন, ঢাকা, ১৯৮২)

জেনারেল জিয়া জাতীয় সংসদের নির্বাচন দেন ১৯৭৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংসদে প্রবেশ করেন জামাতে ইসলামীর মওলানা আবদুর রহিম। তিনি তখন দ্বিধাহীনভাবে বলেন : "জাতীয় সংগীত সম্পর্কে আমার বক্তব্য আছে। একটি স্বাধীন দেশে জাতীয় সংগীতে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার এই জাতীয় সংগীতে তা নেই। বর্তমান জাতীয় সংগীত অনেক বছর আগে একজন বিদেশি বিজাতীয় কবি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিলেন।.... বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ভাবধারা এই জাতীয় সংগীতে বিধৃত। আমি মনে করি জাতীয় কবি-সাহিত্যিকদের দিয়ে জাতীয় সংগীত নতুনভাবে রচনা করতে হবে। যা বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জাতীয়তার আদর্শিক ভিত্তিতে রচিত হবে সেই ভিত্তি হচ্ছে ইসলামি আদর্শবাদ।... রবীন্দ্রনাথকে আমি আমাদের জাতীয় কবি বলে স্বীকার করি না।" ('সাপ্তাহিক রোববার', ঢাকা, ২৫ মার্চ, ১৯৭৯)

একজন নির্বাচিত সংসদ-সদস্য (বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'সাংসদ' প্রতিশব্দটি গ্রহণীয় নয়) সংবিধানের ওপর আস্থা স্থাপন করেই সংসদে প্রবেশ করেন। তিনি কীভাবে জাতীয় সংগীত নিয়ে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন তা যে বাংলাদেশের 'প্রগতিশীল' রাজনৈতিক দলগুলি বুঝতে পারেননি তা নয়। কিন্তু এই নিয়ে তারা তখন সোচ্চার হয়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামাতে ইসলামী এখন একটা শক্তি।

বাংলাদেশে জেনারেল জিয়ার আমলে প্রথম যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় ১৯৭৮ সালের ৩ জুন, তাতে মূল প্রার্থী ছিলেন জিয়া নিজে। সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি জেনারেল ওসমানী। 'আমার সোনার বাংলা' জেনারেল ওসমানীর কণ্ঠে সহস্রবার শোনা গেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। সেই নির্বাচনে ক'জন অখ্যাত প্রার্থীও ছিলেন। তাঁদের নির্বাচনী ইস্যু ছিল, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার পরিবর্তন। দেশে তখনো সামরিক আইন বলবৎ ছিল। কারা তাঁদের নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলেন সেটা বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না। সামরিক আইনের অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে কী করে জাতীয় সংগীতকে নির্বাচনী ইস্যু করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে সাহস করলেন সেই রহস্যের উন্মোচন করা কঠিন। তাঁদের প্রশ্রয় এবং অনুমোদন না থাকলে তা হতে পারত না। দেশের রাষ্ট্রপতি ছাড়াও তখন তিনি ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। এরকম একটা বিতর্ক যেন তিনি চাইছিলেন। জিয়াউর রহমান ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক এবং একজন সেক্টর কমান্ডার। তিনি কী তাহলে মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণীকে না জেনেই মুক্তিযুদ্ধের একটি সেক্টরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? ইদানীং গবেষকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জেনারেল জিয়ার ভূমিকা নিয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য উদ্ধার করছেন। সেসব নিয়ে আলোচনার স্থান এখানে নেই। জিয়ার কথা না হয় বুঝে নেওয়া

যায়। কিন্তু সেই নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী, মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি জেনারেল ওসমানীও কেন প্রতিবাদ করলেন না আমাদের কাছে তা রহস্যে ঢাকা। তিনিও কী তাহলে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ হারিয়ে ফেলেছেন : সেই সময় সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ'-এর 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত' প্রসঙ্গে শিরোনামে উপসম্পাদকীয় লিখে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ('দৈনিক সংবাদ', ঢাকা, মে, ১৯৭৮)। তখন 'সংবাদ' ছাড়া ঢাকায় অন্য কোনো সংবাদপত্র তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশ করতে পর্যন্ত রাজি হয়নি, সামরিক আইনের রক্তচক্ষুর ভয়ে। যদিও তখন রাজনীতিকে গৃহরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ পর্যন্ত এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

জেনারেল জিয়া বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। সামরিক অভ্যুত্থানেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। আরো কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলে তিনি হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলাকে বিসর্জন দিয়ে যেতে পারতেন। কিছুদিন ক্ষমতার লুকোচুরি খেলার পর ক্ষমতায় আসেন আরেক সেনাপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। তিনি আবার কবিরূপে নিজেকে পরিচিত করে তুলতে চাইলেন। তিনি যত কবিতা লিখেছেন সব তাঁর নয় বছরের স্বৈরশাসনে। আগেও নয় পরেও নয়। এই নিয়ে এখানে কোনো মন্তব্য করব না। কলকাতার প্রখ্যাত 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে তখন মন্তব্য করেছিল 'বন্দুকের সংগীতে প্রজাপতি'। 'আনন্দবাজার' পত্রিকা গোষ্ঠী এরশাদের মধ্যে কোন্ প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিল এখন আমাদের জানতে ইচ্ছা করে। এরশাদ জিয়ার 'প্রথম বাংলাদেশ' গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর রচিত কবিতায় সুর দিয়ে তাকে করলেন বাংলাদেশের রণসংগীত। তাকে অলিখিতভাবে জাতীয় সংগীতের সমমর্যাদায় উন্নীত করা হল :

"নতুন বাংলাদেশ গড়ব মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম।"

এই গানও গাইতে হত সব সরকারি অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে। কবি হয়ে বিশ্বকবির সোনার বাংলাকে তিনি বাতিল করলেন না তবে তার মর্যাদার অবনয়ন হল। জাতীয় সংগীতের উপরে উঠে গেল এরশাদের রণসঙ্গীত।

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন (৩১ জানুয়ারি ১৯৮২) : "রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশপ্রেম শিখিয়েছেন। ৭১ সাল সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি সৃষ্টি করে নি, ' সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'র আহ্বানই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজকে আমাদের মানসপটে উপ্ত করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশকে সম্ভব করেছে।"

জিয়া, এরশাদরা তো রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশপ্রেম শেখেননি। 'আমার সোনার বাংলা' নিয়ে তাদের কোনো আবেগ ছিল না। তাই তাদের সময়ে সোনার বাংলাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় 'প্রথম বাংলাদেশ' এবং 'নতুন বাংলাদেশকে।

জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসানের পর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরে আসে বিএনপি। সরকারি প্রধান হলেন জিয়ার পত্নী খালেদা জিয়া। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্তদানের বিনিময়ে তৎকালীন পাকিস্তানের

অঙ্গপ্রদেশ পূর্ববাংলার অন্যতম মহৎ অর্জন ছিল বাংলা অ্যাকাডেমী। যা এর আগেই ছিল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন। খালেদা জিয়া সেই বাংলা আকাডেমীর চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দান করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীকে। যার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কোনো অবদান আছে বলে শোনা যায়নি। যিনি দুর্নীতির দায়ে ১৯৮৪ সালে অপসারিত হয়েছিলেন। ১৯৯১ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় সমন্বিত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের এক সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। সেই অনুষ্ঠানে এক বক্তা বলেন, "বঙ্গভঙ্গের সহযোগী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয় সংগীত জাতি শুনতে চায় না। জন্মের সময় যে আজান দেয়া হয় তাই আমাদের জাতীয় সংগীত।"

বিচারপতি চৌধুরী তার ভাষণে বলেন, "অসংখ্য কিন্ডারগার্টেনে ভালো শিক্ষার নামে বিদেশী শিক্ষা তথা গয়া-কাশী-বৃন্দাবন শেখানো হচ্ছে।"

বিএনপি'র নিয়োজিত বাংলা অ্যাকাডেমীর চেয়ারম্যানের বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। 'গয়া-কাশী-বৃন্দাবন' বলে যা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। যা কিছু কাফেরদের সৃষ্টি তা মুসলিম চেতনার পরিপন্থী। তাকে বর্জন করতেই হবে। মৌল ইসলামের সংগীত হতে পারে না। খালেদা জিয়া ' তোমার সোনার বাংলাকে বদলাতে পারেননি। তবে সে সময় 'প্রথম বাংলাদেশ' আবার জ্বল জ্বল করে উঠেছিল।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পালাবদলে এরপর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা। তাঁদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' নিয়ে তাদের আবেগ এবং দায়িত্ব দুই-ই ছিল। এবার তাই আঘাত করা হতে লাগল অন্যদিক থেকে, এবং তাতে সেনাপতির ভূমিকা ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত, মৌলবাদীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত মৌলবাদী দৈনিক 'ইনকিলাবে'। এই পত্রিকায় জন্মদাতার পরিচয় এবং পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাস নিয়ে এখানে কোনো আলোচনা করব না এই পত্রিকায় জাতীয় সংগীতের বিরোধিতা করা হচ্ছে মুসলমানদের স্পর্শকাতর বিষয়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে এবং তা প্রচার করা হচ্ছে মুসলমানদের কাছে পবিত্র মাসরূপে পালিত রমজান মাসে। 'ইনকিলাব' প্রশ্ন তুলেছে রমজানে এই সংগীত গাইলে মুসলমানদের রোযা করে কি না ?

"ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।
কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো।
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে"

আমাদের জাতীয় সংগীতে দাবি করা হয়েছে মা ক্ষেত সব ফসলে ভরে দিয়েছেন কিন্তু কোরআন পাকে দাবি করা হয়েছে, "আর তাহাদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন এই মৃত অনুর্বর ভূমি আমি তাকে জীবন্ত ও উর্বর করিয়াছি অথবা আমি উহা হইতে শস্য উৎপাদন করিয়াছি ফলে উহা হইতেই তাহারা খায়।" (আয়াত ৩৩, সূরা ইয়াসীন)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা মা ও বাবা কোনোটাই নন। তিনি নারী বা পুরুষের ঊর্ধ্বে। তার কোনো আকার নেই। তিনি সম্পূর্ণ নিরাকার। এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ মানব ধারার অতীত এক অস্তিত্ব। আল্লাহকে সুখ-দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু জাতীয় সংগীতে রয়েছে, "মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি।" জাতীয় সংগীতে বলা হয়েছে—'বটের মূলে নদীর কূলে' তথা গোটা বাংলাদেশ হল মা'র। মুসলমানের বিশ্বাস সার্বভৌমত্ব হল আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহকে অস্বীকার করে মাতৃবন্দনায় রচিত এই জাতীয় সংগীত কবুল করার পর আল্লাহ কি এই জাতির রোযা কবুল করবেন ?

রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায় বর্ণিত 'ভরা ক্ষেত', 'আঁচল', 'বটের মূলে', 'নদীর কুলে' সবই মা'র দৈহিক প্রকাশ। বাংলাদেশের আত্মা হলেন মা। ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে... মা সম্বোধন দ্বারা দেশমাতৃকাকে আহ্বান করা হচ্ছে।

"নিশ্চয় আল্লাহ তাহার সহিত অংশীস্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না। এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া থাকেন। এবং যে আল্লাহর সহিত অংশীস্থাপন করে, তবে নিশ্চয় সে শুধু বিপথে বিভ্রান্ত হইয়াছে। উহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে নারী প্রতিমাপুঞ্জকেই আহ্বান করে এবং তাহারা শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না।" (আয়াত ১১৬ ও ১১৭, সূরা নেসা)

শুধু মা'র গুণগান যা আমাদের তথা তৌহিদবাদীদের বিশ্বাস বিরুদ্ধ শেরক। জাতীয় সঙ্গীত আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে পরিণত করেছে। আমাদের শিশুরা বিদ্যালয়ে নিয়মিত সংগীত গাওয়ার ফলে মা'র প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের আল্লাহ-রাসূলের কথা শোনানো হয় না। (ওবায়দুল হক সরকার—'আমাদের রোযা হবে কি?' 'দৈনিক ইনকিলাব', ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯৭)

'ইনকিলাব' মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের আয়াত বিশ্লেষণ করে 'সিয়াম' (রমজানের উপরাস) সাধনায় ৭৩ মুসলমান জনগণের ধর্মান্ধভূতিকে উস্কে দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের অন্তর্নিহিত অর্থ ইসলামের মৌল ধ্যান ধারণার বিরোধী, ঈমান আকীদার পরিপন্থী। এই সংগীত মুসলমানদের জন্যে 'শেরক' (আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করা)। এইভাবে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে 'ইনকিলাব'। কিন্তু ওবায়েদুল হক সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর বা কোনো পত্রপত্রিকার জোরালো কোনো প্রতিবাদ চোখে পড়েনি। তাঁরা হয়তো একে প্রতিবাদযোগ্য বলেই মনে করেননি। কিন্তু চোখ বন্ধ করে রাখলেই কী বন্ধ থাকবে এই মৌলবাদী তাণ্ডব ?

বাংলাদেশের স্কুলে ছাড়া কোনো মক্তব-মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। যদিও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিনের শুরুতে ছাত্রদের জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক। স্কুলে 'আমার সোনার বাংলা' থাকলেও মাদ্রাসায় তা নেই। মাদ্রাসায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক আছে। তাঁর রচিত জাতীয় সংগীতকে শ্রদ্ধা জানানো মুসলমান শিক্ষার্থীদের ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাঁরা তা হতে দিতে পারেন না। জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা যে প্রকারান্তরে রাষ্ট্রদ্রোহীতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সেই বোধটুকুও যেন নেই।

শেখ হাসিনার শাসনকালে 'ইনকিলাব' নানাভাবে বিচিত্র সব রচনা প্রকাশ করে, জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি তুলেছে। সাংবাদিক ইবনে গোলাম সামাদ 'ইনকিলাবে' লেখেন : " যে কোন গানই একটা দেশের জাতীয় সংগীত হতে পারে না। তা তার সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক না কেন।... আজকের বাংলাদেশ মূলত বাংলাভাষী মুসলমানের সংগ্রামের ফল। এর আছে একটা পৃথক ঐতিহ্য। যেটা কেবল রবীন্দ্র সাহিত্যের নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ' সোনার বাংলা' গানটিকে গ্রহণ করা হয় আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে। আমার জানা মতে, এই গানটি আমাদের উপর কার্যত চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে, একটা বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে। ১৯৭২ সালে সব ক্ষেত্রেই ভারতের চাপ ছিল প্রচণ্ড যা অস্বীকার করা সে সময় সম্ভব ছিল না। যে কারণে গানটিকে আমাদের উপর মহল বিশেষের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল সেটা এখন অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।...

...আমরা যা পারি, তা হল, বিশ্বের কাছে আমাদের পৃথক সত্তার পরিচয়কে বিশেষভাবে তুলে ধরতে। এ কারণে, রবীন্দ্রনাথকে, ' সোনার বাংলা' গানকে আর জাতীয় সংগীত রাখা উচিত হবে না। আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে অন্য কোনো গান...। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এই পরিচয় হতে পারে না। ('জাতীয় সংগীতের পরিবর্তন চাই', ' দৈনিক ইনকিলাব', ঢাকা, ১৩ আগস্ট ১৯৯৯)

এই আলোচনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এখানে যে ভাবে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কথা বলা হয়েছে, তার মূলে কোনো সত্যতা থাকলে জেনারেল জিয়ার পার্শ্বদরাই তা প্রকাশ করে দিতেন। এই অভিযোগের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের মুসলমানদের ভারত বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা, যেটা আবার তাঁরা পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর মাহবুব উল্লার দাবিও তাই। তবে তাঁর ভাবনা অন্য ধারার : " যে গানটিকে সাময়িকভাবে জাতীয় সংগীত হিসেবে ধারণ করা হল তা এমন কবির রচিত যার অপর একটি গান প্রতিবেশী হিন্দু ভারতের জাতীয় সংগীত। যিনি বৃহত্তম ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের মধ্যেই নিজ পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা এক আত্মবিস্মৃত জাতি যে আমাদের দেশীয় কবির রচিত কোন গানের মধ্যে জাতীয় সংগীত হবার মতো উৎকর্ষ খুঁজে পেলাম না অথবা একাত্তরের রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়েও আমাদের কোন কবির পক্ষে সে রকম যোগ্য একটি গান রচনা করা সম্ভব হল না। আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্মাণের এই ব্যর্থতা ক্ষমার যোগ্য নয়।" (' দৈনিক ইনকিলাব', ঢাকা, ৮ জুন ২০০০)

মাহবুব উল্লার কাছে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলাকে জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করা হল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সুবিবেচনা ও সুচিন্তা বিবর্জিত উত্তেজনার প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে হিন্দু ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদের কবি। তাঁর রচিত কোনো গান জাতীয় সংগীতরূপে মুসলিম দেশের জন্যে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাঁর মতে এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও তিনি ভুলে যান, ১৯৭২-এর সংবিধানে জাতীয় সংগীত ক সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এমন কোনো ধারা নেই। তাহলে জেনারেল জিয়া কী তার সুযোগ নিতেন না? এটা তাঁর ভুল নয়—

ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন এমন কোনো কথা তাঁর কঠোর সমালোচকেরাও বলেননি। ভারত শুধু হিন্দুর দেশ নয়, বাংলাদেশও নয় শুধু মুসলমানদের দেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হয়ে মাহবুব উল্লা শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধেয় নন, বাংলাদেশে অমুসলমানদের অস্তিত্ব স্বীকারেও তিনি কুণ্ঠিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরো একজন অধ্যাপক ডক্টর আফতাব আহমদ মনে করেন, "বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে আমরা পেয়েছি ইতিহাসের গতিধারায় বিকাশসহ একটি জনগোষ্ঠীর জায়মান আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে কেন্দ্র করে যে নীড় রচিত হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায়। ব্যাপারটি ছিল একদিকে আবেগের অর্থাৎ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের। আরেক দিক ছিল স্বপ্নচারিতার অর্থাৎ কল্পনা বিলাসের। এর দার্শনিক ভিত্তি তৈরী করার যে কৃষ্টিক ও তাত্ত্বিক কর্তব্য সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক ছিল সেদিকে নজর দেওয়ার মত কোন যোগ্য ব্যক্তিত্বই এ দুর্ভাগা দেশে জন্ম নেয়নি।"

তিনিও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধেয় নন। একসময় তিনি জড়িত ছিলেন ' বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে'র রাজনীতিতে। সেই তিনি রূপ পাল্টে বাংলাদেশী মানস জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণে এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নির্মাণে সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শের প্রতিফলন চান। ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রামের পিছনে যে আবেগ ছিল, যে দর্শন ছিল তাঁর কাছে তা ভ্রান্ত বলে মনে হয়। তিনিও জাতীয় সংগীতরূপে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলাকে বর্জন করার পক্ষে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আর একজন অধ্যাপক ডক্টর হাসানুজ্জামান চৌধুরীও সাপ্তাহিক কলাম লেখেন 'ইনকিলাব'-এ। তিনি মনে করেন, "মুসলিম নিধনকারী মারাঠা শিবাজীর পূজারীদের যাবতীয় স্বার্থের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণকারী, একান্তভাবেই হিন্দুমানসে পরিচালিত এবং মুসলিম স্বার্থবাহক ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতাকারী চূড়ান্ত মাথায় হিন্দু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কোনোক্রমেই আমাদের নিকট আদর্শ নন। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার স্বপ্ন ও গান বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সৃষ্ট মুসলিম পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের উৎখাতের লক্ষ্যে এবং অখণ্ড রামরাজত্বে হিন্দু বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছিল পরিচালিত...।" (' দৈনিক ইনকিলাব', ঢাকা, ২ অক্টোবর ১৯৯৯)

কী চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা এবং ইতিহাসের ভুল বিশ্লেষণ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকদের। এঁদের এই মানসিকতা শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতা এবং অজ্ঞানতাকে দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ডক্টর মুস্তাফা নূর-উল ইসলামের ভাষায়, এঁদের এই মানসিকতাকে 'অজ-মুর্খামি'-ও বলা যায় না। এঁরা হলেন মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার তাত্ত্বিক দর্শনের নতুন প্রবক্তা—যা সব সুন্দরকে বিনাশ করতে চায়। এঁরা বাংলাদেশকে পরিণত করতে চান এক মৌলবাদী রাষ্ট্রে। তাঁরা একত্রিত হয়েছেন দৈনিক ইনকিলাবকে কেন্দ্র করে। জাতীয় সংগীত নিয়ে এই ঘৃণ্য অপপ্রচার দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে। সরকার এঁদের বিরুদ্ধে কেন কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বা নিতে পারছেন না? তাঁদের মধ্যেও কী তবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে? তাঁদের অনেকেই হয়তো ততদিনে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ এবং দর্শন থেকে দূরে সরে গিয়েছেন।

এই বিতর্কেও জরুরি প্রয়োজন বাংলাদেশে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতো মানুষদের। তিনি রবীন্দ্রনাথকে তুলনা করেছেন নিরুদ্দেশের মেঘের সঙ্গে। 'আমার সোনার বাংলা' গানটি রচনার পটভূমিকে মেনে নিয়েও তিনি মনে করেন এই গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হওয়ার উপযুক্ত : "রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' যে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হতে পেরেছে তার কারণ এতে মাতৃভূমিকে দেবী হিসাবে কল্পনা করা হয়নি, তাকে কল্পনা করা হয়েছে মাতৃভূমি হিসেবেই। এই গান বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে লেখা হয়েছিল, গাওয়া হয়েছিল ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট, কিন্তু এ গান ভালোবাসার। এতে ফ্যাসিবাদী তীব্রতা নেই, ভাব নেই যুদ্ধংদেহী।" ('বাঙালীর জাতীয়তাবাদ', ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৯১)

জাতীয় সংগীতের 'ইনকিলাবে'র সর্বশেষ বিষোদগার হল 'প্যারোডি জাতীয় সংগীত' প্রকাশ। ঢাকার শ্যামলী থেকে জনৈক আ. সা. মোশারফ এটির রচয়িতা। 'ইনকিলাবে' এটি প্রকাশিত হয় ২০ অক্টোবর ২০০০ সালে—

"আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় শাসন করি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার বাবার স্বপ্নে ভরি-ঐ
ওমা সন্ত্রাস করে এই দেশেতে
আমার পোলাপানে—
মরি হায় হায়রে—
ওমা সুযোগ পেলে আদালতে
আমরা আজও লাঠি ধরি
সোনার বাংলা আমি তোমায় শাসন করি।
কি মজা, কি ভাল গো
কি সুখ, কি আরাম গো,
কি পয়সা ছিঁটায়েছ আমার তরে
দলের ঘরে ঘরে—
মা তোর দেশের যদি আবার আমি
প্রধান হতে পারি
মরি হায় হায়রে—
মা তোর মদন বাবার স্বপ্ন দেখে
ওমা আমি তবেই যাব মরি—
সোনার বাংলা আমি তোমায় শাসন করি।"

এবারও প্রতিবাদ করেন সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ। তাঁর লেখা উপ-সম্পাদকীয় 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অবসান হোক' শিরোনামে

('দৈনিক সংবাদ', ২৩ নভেম্বর ২০০০)। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্য একটি দৈনিক 'জনকণ্ঠ' এ নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ তুলেছিল। জাতীয় সংসদে তা নিয়ে নজিরবিহীন আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাতে অংশ নিয়েছিলেন। জাতীয় সংগীতের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বাঁধভাঙা যে অপপ্রচার তার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল এই প্যারোডি। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের কোনো চিত্তচাঞ্চল্য ছিল না। টনক নড়ল অনেক পরে। অনেকেই অবশ্য বলেন প্রকাশিত সেই প্যারাডিতে যদি হাসিনাকে অশালীনভাবে তুলে ধরা না হত তা হলে তখনো সরকার নড়েচড়ে বসত না। বাংলাদেশ সরকার এই প্যারোডিকে নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'ইনকিলাবে'র সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে মামলা দায়ের করে ১৩ নভেম্বর ২০০০ সালে। ২০ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এতটা সময় নিল কেন? এর উত্তর আমাদের জানা নেই। অনেক অনেক মামলার ক্ষেত্রে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই।

প্রত্যেক দেশেই জাতীয় সংগীত নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য থাকে। থাকে জাতীয় আবেগ। সব রাজনৈতিক দলের আদর্শের ঊর্ধ্বে থাকে তা। জাতীয় সংগীতের অবস্থান এত দলনিরপেক্ষ থাকে যে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলার কথা কেউ চিন্তা পর্যন্ত করে না, শুধু বাংলাদেশই তার ব্যতিক্রম। এখানে জাতীয় সংগীত নিয়ে জাতি দ্বিধাবিভক্ত।

বাংলাদেশের পরের নির্বাচনে, যা ছিল সবচেয়ে বিতর্কিত, শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ পরাজিত হলে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন খালেদা জিয়া। তিনি সরকার গঠন করেন মৌলবাদী ইসলামী দলগুলির সমর্থন নিয়ে। খালেদা জিয়ার সরকারে অংশ নেন জামাতে ইসলামী। আবার নতুন করে জ্বলে ওঠে 'প্রথম বাংলাদেশ...'। ' সোনার বাংলা' আবার ঔজ্জ্বল্য হারায়। জামাতে ইসলামী চাইলেও খালেদা জিয়া জাতীয় সংগীতে পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ নেননি। জামাতে ইসলামীকে মন্ত্রীসভায় ঠাঁই দিলেও তাদের দলের প্রভাব যাতে খুব বেড়ে না যায় সে ব্যাপারে তিনিও সচেতন ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থেকেছেন পুত্রকে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে এবং আখের গোছাতে। আমাদের জন্যে সেই আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। যেমন প্রাসঙ্গিক নয় বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচন এবং ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে কোনো আলোচনা।

এর মধ্যে বাংলাদেশের কত নদী দিয়ে কত জল বয়ে গেল। আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন বঙ্গবন্ধু-নন্দিনী শেখ হাসিনা, সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। যেখানে তাঁর নিজের দলেরই রয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অভাবনীয় কিছু না ঘটলে, যা ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বাংলাদেশে, নির্ধারিত সময়ের আগে তাঁর ক্ষমতা হারাবার কোনো ভয় নেই। কিন্তু আবার হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে, জাতীয় সংগীতের পরিবর্তন দাবি করে মাঠে নেমে পড়েছে জামাতে ইসলামী। তারা বিভ্রান্ত করছে বাংলাদেশের মুসলমানদের। বাংলাদেশে একটি টিভি চ্যানেল আছে 'ইসলামী টিভি' নামে। যার মালিক হলেন খালেদা জিয়ার সহোদর, প্রাক্তন সংসদ সদস্য সৈয়দ ইসকান্দার। এই টিভি চ্যানেল বাংলাদেশের ইসলামী চেতনা বিকাশের বৈদ্যুতিক

মাধ্যম। সেখানকার এক প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ মুহিব খান জেহাদী ইসলামী গানের জনপ্রিয় গায়ক। তাঁর প্রকাশিত গানের সিডি হাজার হাজার বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশে। সম্প্রতি জামাতে ইসলামী প্রকাশ্য সভায় দাবি জানিয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' পরিত্যাগ করে মুহিব খানের লেখা 'ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি' গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিতে হবে (সংবাদ সূত্র : 'আনন্দবাজার পত্রিকা', কলকাতা, ২৬ জুন ২০০০)। পুরো গানটি এখনো আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। আবার শুরু হয়েছে জাতীয় সংগীতের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানোর সেই পুরানো খেলা। এই নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়নি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায়। তারা এর আগে যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন মৌলবাদী ইসলামী দল এবং পত্রপত্রিকা রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর রচিত জাতীয় সংগীত নিয়ে আশালীন বিতর্ক শুরু করেছিল। আবার যখন সেই দল জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে শুরু করা হয়েছে সেই অশোভন বিতর্ক, ধর্মের নামে, জেহাদের নামে, ইসলামী মূল্যবোধের নামে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতির সঙ্গে একের পর এক আপস করেছে বর্তমানে ক্ষমতাসীন শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁরা মেনে নিয়েছেন সংবিধানের সাম্প্রদায়িকরণ, মুখে তাঁরা যাই বলুন, সেটা মনে হয় তাঁদের কাছে বর্তমানে চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতা। একসময় তাঁরাও যে 'আমার সোনার বাংলাকে পরিবর্তন নিয়ে আপস করবেন না তেমন নিশ্চয়তা নেই। ১৯৭৫ থেকে ২০০৯, এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া, জনমানসে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা। বর্তমান জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত পরিবর্তনে তাদের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। যে সব শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক এবং অন্যান্য পেশাজীবীর মানসে এখনো অসাম্প্রদায়িকতার, আধুনিকতার, ইহজাগতিকতার শুদ্ধ চেতনা প্রবাহিত তাঁদের সংখ্যা বড় কম বাংলাদেশে, তাঁরা প্রতিবাদ করবেন, প্রতিরোধের সড়কে নামবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবেন এমন আশা নেই। এটাই এখন বাংলাদেশের সমাজ-বাস্তবতা।

জাতীয় সংগীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' আর গীত হবে না বাংলাদেশে। কিন্তু তারপরেও রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে থাকবেন, অবশ্যই থাকবেন।

শারদীয়া উদয়ন,
নিউইয়র্ক,
আশ্বিন, ১৪১৬

বাংলাদেশের জাতীয় ধ্বনি : 'জয় বাংলা'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল ২৬ মার্চ, ১৯৭১। সেদিন কোনওরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে, পাকিস্তানের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নিজে কারাবরণ করলেও তাঁর সুযোগ্য সহযোগীরা তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। শেখ মুজিব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে না পারলেও মুক্তিযোদ্ধাদের হৃদয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। শুধু নিরঙ্কুশ বললেও সবটুকু বলা হয় না, জাতীয় পরিষদে পূর্বপাকিস্তানের জন্যে নির্দ্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল ১৬৭টি আসন। জনগণের সেই রায়কে অস্বীকার করেছিলেন পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান, শুধু মুক্তিযুদ্ধ-ই পরিচালিত হয় নি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে, যখন মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল, তখন সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ।

বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ। কথাটা বলেছেন সে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। তাই সে দেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে তা নিয়ে বিতর্ক হয়। কোনও এক 'ভুইফোঁড়' সেক্টর কমান্ডারের চাটুকাররা তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষকরূপে তুলে ধরেন। চুরি হয়ে যায় ইতিহাস। মামলা গড়ায় হাইকোর্টে, হাইকোর্ট যথাযথ রায় দিলেও সেই বিতর্কের স্থায়ী সমাধান হয় না। একমাত্র বাংলাদেশেই মনে হয় সম্ভব সামরিক ফরমানে সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন। পরে তা নিয়ে হস্তক্ষেপ করেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সামরিক ফরমানে সংবিধান সংশোধন অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু তারপরও যারা সেই কুকর্মের জন্যে দায়ী তাদের কোনও শাস্তি হয় না। নিষিদ্ধ হয় না তাদের রাজনীতি। এই আলোচনা অনেক দূর টেনে নেওয়া যায়। আপাতত আমরা সেই আলোচনায় যাব না।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্তিলাভ করে। অর্জন করে তার সার্বভৌমত্ব। তার রাষ্ট্রীয় সীমানা। ১৬ ডিসেম্বর

বাংলাদেশের জাতীয় দিবস। এসব বহু চর্চিত কথা। নতুন করে বলার মতো কিছু নেই। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এই ইতিহাসও বিতর্কের ঊর্দ্ধে নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় চার দশক। এখনো সেই দেশে স্বাধীনতার অনেক মূলনীতি নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি হয় নি। কোনও দিন হবে বলেও মনে হয় না। তার কারণ নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। আমরা শুধু একটি বিষয় এখানে তুলে ধরবো। সেটি হলো বাংলাদেশের জাতীয় ধ্বনি।

জাতীয় রণধ্বনি বা জাতীয় ধ্বনি নিয়ে যে কোনও স্বাধীন দেশের মানুষ গৌরব বোধ করেন। সেখানে সকলে দল-মত বা রাজনীতির ঊর্দ্ধে উঠে যান। 'অ্যান অ লাফাঁ দ'লা পাতৃ' ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীত ' মেয় সেই য়েজ'-এর প্রথম কলি। এটি ফরাসী বিপ্লবের রণধ্বনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, তারপর থেকে যত দলই ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসুক না কেন এই জাতীয় ধ্বনি নিয়ে কোনও বিতর্ক সৃষ্টি হয় নি। ওদের জাতীয় রণধ্বনি সেদেশে আপন মহিমায় এখনো প্রদীপ্ত। ফ্রান্সে যখনই কেউ একজন বলে ওঠেন 'অ্যান-অ লা-ফাঁ', সাথে সাথে অন্যরা বলে ওঠেন 'দ'লা পাতৃ'। এই জয়ধ্বনি উচ্চারণের সময় কেউ ভাবেন না যে তিনি গলপন্থী না সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট না মধ্যপন্থী। সেই দেশে এই জাতীয় ধ্বনি সকলের সম্পদ।

কিন্তু বিচিত্র বাংলাদেশ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের রণধ্বনি ছিল 'জয় বাংলা'। অধিকৃত বাংলাদেশের দামাল মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' রণহুঙ্কার দিয়েই জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ভাবনাহীন চিত্তে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার দুর্জয় শপথ নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

'জয় বাংলা' জয়ধ্বনি হিসেবে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল শেখ মুজিবের কণ্ঠে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশে এখন যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁরা মনে করেন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সন্তান শেখ মুজিব রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন একই জেলার মাদারীপুর মহকুমার বিপ্লবী বীর পূর্ণচন্দ্র দাসের জীবন থেকে। ১৯৩৬-৩৭ সালে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের হাতে কারাবরণ করেন বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র। তিনি তখন মাদারীপুর কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি মুক্তি পাওয়ার পর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পূর্ণচন্দ্র দাসকে অভিনন্দন জানাতে 'পূর্ণ-অভিনন্দন' নামে একটি গান রচনা করেন। সেই গানে নজরুল 'জয় বাংলা' শব্দযুগল ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে এই গান নজরুলের 'ভাঙার গান' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই শব্দ-যুগল থেকে প্রেরণা লাভ করে পরবর্তীতে 'জয় বাংলা'-কে শেখ মুজিব শুধু তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক শ্লোগান রূপেই গ্রহণ করেন নি, বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে জাতীয় ধ্বনি রূপেও তুলে ধরেন। কাজেই 'জয় বাংলা' রণধ্বনি বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের দলীয় ধ্বনি না থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় ধ্বনির মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। এই দল যে নির্বাচনে বাংলাদেশের আপামর জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিল সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশ পূর্বপাকিস্তানের নতুন নামকরণ 'বাংলাদেশ' শেখ মুজিব-ই

করেছিলেন। এই নামকরণেও তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম' গানটি থেকে।

ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা বহন করে সর্বজনীন 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর আদর্শকে ধারণ করে বাংলাদেশের সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল তা এখন সে দেশে চরম বিতর্কিত। 'জয় বাংলা'র 'জয়' শব্দটি বাংলাদেশিরা আর গ্রহণ করতে রাজি নন। এটি নাকি হিন্দুয়ানি শব্দ, যা বাংলাদেশের মুসলমানরা গ্রহণ করতে পারেন না। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকরা সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। তারপর থেকে জাতীয় ধ্বনি হিসেবে 'জয় বাংলা' নির্বাসিত। নব্য বাংলাদেশিদের কাছে 'জয় বাংলা'র পরিবর্তে তুলে ধরা হয়েছে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে তারা সে দেশের 'মুসলমান' জনগণকে বুঝিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' রণধ্বনির সাথে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিও দিয়েছে। যারা শুধু 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়েছে তারা ছিল ছদ্মবেশী ভারতীয় চর। ভারতের 'জয় হিন্দ্' ধ্বনির সাথে মিল রেখে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে গ্রাস করার অভিসন্ধি থেকেই ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর 'জয় বাংলা' ধ্বনি চাপিয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক কোনও ধ্বনি মুসলিম বাংলার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাদের জাতীয় ধ্বনি হলো 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'।

'জিন্দাবাদ' শব্দটির উৎস 'জিন্দা'। শব্দটি কোনও ইসলামী শব্দ নয়। ইসলামের উৎস ভাষা আরবী, যাকে বলা হয় আল্লাহর মুখের ভাষা। সেই আরবী ভাষায় 'জিন্দা' বলে কোনও শব্দ নেই। এটি একটি ফারসী শব্দ। কিন্তু আধুনিক ইরানে এই শব্দটির প্রচলন নেই। ভারত উপমহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে 'জিন্দাবাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। এই উপমহাদেশে বামপন্থীরা বিশেষ করে বিপ্লববাদীরা 'ইনকিলাব'-এর সাথে 'জিন্দাবাদ'-কে জুড়ে দিয়ে তাদের প্রিয় শ্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' রচনা করেছেন। এই ফারসী শব্দটি কীভাবে বিপ্লবের সাথে যুক্ত হয়েছে তার ইতিহাস মনে হয় তারাও জানেন না। 'জিন্দাবাদ' শব্দের ব্যাপক প্রচলন এখন শুধু পাকিস্তানে—বাংলাদেশে। অন্য কোথাও নয়। কিন্তু পাকিস্তানে 'জিন্দাবাদ' যেমন আছে তার সাথে 'জিয়ে' শব্দটিও আছে। যার অর্থ 'জয়'। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে 'জিয়ে' উচ্চারিত হয় যেভাবে 'জিন্দাবাদ' উচ্চারিত হয় না সেভাবে। সিন্ধুরা 'জিয়ে সিন্ধ', 'জিয়ে ভুট্টো' বা 'জিয়ে বেনজির' বলে এখনো লক্ষকণ্ঠে ধ্বনি তুলে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেন। পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে 'জিয়ে সিন্ধ'-এর সাথে 'জয় হিন্দ্'-এর সম্পর্ক রয়েছে বলে সেই ধ্বনিকে বর্জন করার ডাক দিয়েছেন এমন কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। 'জিয়ে' শব্দে হিন্দুয়ানি নেই, কিন্তু 'জয়' শব্দে আছে। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা সেই ধারণাটাই তুলে ধরেছেন বাংলাদেশি মুসলমানদের কাছে। তাই তারা ফতোয়া দিয়েছেন 'জয় বাংলা' ধ্বনি না দিয়ে হুঙ্কার দিতে হবে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে। 'জিন্দাবাদ' শব্দে আছে ইসলামী জোশ, 'জয়' শব্দে রয়েছে পৌত্তলিকতা। আমরা জানতাম মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। কিন্তু বাংলাদেশের মোল্লারা মসজিদের চত্বর ডিঙিয়ে প্রবেশ করেছে

জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সমাজ, বলতে গেলে জীবন-চর্চা এবং জীবনচর্চার সর্বস্তরে। ভাবনাটা আমাদের নয়, বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিসেবীদের।

যে জিন্দাবাদ শব্দের উৎস এককালের পারস্যে, আজকের ইরানে তা উচ্চারিত হয় না, তারা 'ইরান জিন্দাবাদ' বা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের রূপকার খোমেইনির জয়গান গাইতে ' খোমেইনি জিন্দাবাদ' বলেন না। পরিবর্তে ইরানিরা দেশের নামে জয়গান গাইতে ধ্বনি দেন 'ইশতুকলাল অওজাদী (আজাদী) জমহুরিয়ে ইসলামী' বলে, কখনো 'জমহুরিয়ে ইসলামী জিন্দাবাদ' বলেন না। তারা তাদের জননেতার জয়গান গাইতে হলে 'ইয়ারে ইমাম খোশ আমদিদ' কিংবা ' খোদা দেতারঅ নিগাহ্ দর' বলেন। কোনও অবস্থাতেই ' খোমেইনি জিন্দাবাদ' নয়।

পৃথিবীর অন্য কোনও মুসলিম দেশে 'জিন্দাবাদ' নেই। সৌদি আরবের মানুষ তাদের দেশপ্রেম প্রকাশ করেন 'আল বালাদি, আল বালাদি, আল ওয়াতান' (আমার দেশ, আমার দেশ, আমার পিতৃভূমি) বলে। অধিকাংশ আরবী ভাষাভাষী দেশ জয়ধ্বনি হিসেবে দেশের নামের সাথে 'তাহিয়া' বা 'আত-তায়িস' শব্দটি জুড়ে দেন। যেমন লিবিয়ার অধিবাসীরা বলেন 'তাহিয়া আল জামাহিরিয়া বা' বা 'আত তায়িয় জামাহারিয়া'। লিবিয়াতেও 'লিবিয়া জিন্দাবাদ' বলে কোনও ধ্বনি নেই, যেমন নেই সৌদি আরবে 'আরাবিয়া আস সৌদিয়া জিন্দাবাদ' বলে।

আলজিরিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সময় ওদের মাতৃভাষায় রচিত রণধ্বনি ছিল 'ইয়াহ ইয়া আলহ জাজায়ের'। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন আলজিরিয়ার এটাই জাতীয় জয়ধ্বনি। মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ধ্বনি হলো 'ইন্দোনেশিয়া মের্দেকা', যা ওদের মাতৃভাষায় রচিত। কোনও মুসলিম দেশ তাদের চিহ্নিত শত্রুদের সাথে আপোস করে নি, যেভাবে করেছে বাংলাদেশ। 'জয়বাংলা' জয়ধ্বনি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই জয়ধ্বনিকে যেসব বাংলাদেশিরা পরিত্যাগ করেছে তারা আসলে আত্মপরিচয়ের সঙ্কটেই ভুগছে। তারা বাংলাভাষা কালের স্বাভাবিক প্রবাহে যে সব শব্দকে গ্রহণ করে নিয়েছে তার জাতবিচার করে সেসব শব্দকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চায়। শুধু আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে নয় তাদের এই মনোভাবের পিছনে রয়েছে চরম সাম্প্রদায়িকতা।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবুল মোমেন মনে করেন—' কোনও পরিণত জাতি তার ইতিহাসের পরম্পরাকে এবং অর্জন সমূহকে অস্বীকার করে না। কারণ পরিণত মানুষের ভুইফোঁড় হতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তাঁরা জানেন যে ইতিহাস ও ঐতিহ্যই সংস্কৃতির বীজতলা। সেখান থেকে পরিচর্যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের ফলন সম্ভব হয়। তাকে কাঠগড়ায় তুললে সংস্কৃতির বাতাবরণ না পেয়ে ধর্মও ধার করা শাস্ত্রে পর্যবসিত হবে...।'

'জয় বাংলা'-কে নির্বাসিত করে যিনি 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনিকে পাকিস্তানের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলেন তিনি বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় পরিচয় বাঙালি থেকে বাংলাদেশিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন বাংলাদেশিদের কোনও দেশীয় সংস্কৃতি নেই। সেই সংস্কৃতি তিনি নির্মাণ করবেন।

কাজেই আবুল মোমেন যাই বলুন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন ধর্মের আবরণে সব কিছুকে ঢেকে দিতে চান। তাদের ভুইফোঁড় হতে কোনও লজ্জা নেই। বরঞ্চ সেটাই যেন তাদের জন্যে গৌরবের।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর একটানা ২১ বছর নির্বাসিত ছিল 'জয় বাংলা' ধ্বনি। সেই কালটা ছিল জিন্দাবাদের। ১৯৯৬-এ আবার বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসে। ততদিনে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেছে। ছিনতাই হয়ে গেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সব অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ। শুধু 'জয় বাংলা'-ই নির্বাসিত হয় নি, সংবিধান থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। সংবিধানে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্র ধর্ম রূপে 'ইসলাম'। সংবিধানের প্রারম্ভে উঠে এসেছে 'বিসমিল্লাহ'। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের সব অমুসলমান এখন সে দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। যিনি যেভাবেই বাংলাদেশের সংবিধানকে ব্যাখ্যা করুক না কেন এটাই হলো বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্যে বাস্তব অবস্থান। যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূল আদর্শ করে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল, তাঁর সেই রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখার প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জনের সাথেই যেন আপোস করতে রাজি। 'জয় বাংলা' ধ্বনিকে বিসর্জন দিতেই বা বাধা কোথায়!

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক 'জয় বাংলা' জাতীয় ধ্বনি হিসেবে আর একাত্তরের মহিমায় ফিরে আসবে না। এখন এই ধ্বনি শুধু আওয়ামী লীগের কয়েকজন বর্ষীয়ান নেতার কণ্ঠে শোনা যায়। তা-ও বড় ক্ষীণ কণ্ঠে। ১৯৯৬-এ ক্ষমতায় এসে পাঁচ বছর পর সেই ক্ষমতা আবার হারাতে হয়েছিল আওয়ামী লীগকে। ২০০৯-এ আবার বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা ফিরে পেয়েছে আওয়ামী লীগ বন্ধুবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। যদিও নির্বাচনে আওয়ামী লীগ 'মহাজোট' গঠন করেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তবুও একক দল হিসেবে তারা জনগণের এমন ম্যান্ডেট পেয়েছে, যাতে তারা যদি চায় সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করতে পারে। কিন্তু শেখ হাসিনা সেই পথে যাবেন বলে মনে হয় না। তিনি এখন বক্তৃতা শুরু করেন 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে, শেষ করেন 'বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক' বলে। 'জয়বাংলা'ও বলেন তবে জাতীয় ধ্বনির মর্যাদায় অভিষিক্ত করে নয়। আওয়ামী লীগের কর্মীরা আর 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে বাংলাদেশের আকাশে ঝড় তোলেন না। এখন আওয়ামী লীগের প্রচারপত্রে লেখা থাকে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' (আল্লাহু আকবর)। নির্বাচনী শ্লোগান হয় 'লা ইলাহা ইল্লাহা, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ'। নৌকা জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক। এখন আওয়ামী লীগের সভা শুরু হয় কোরান তেলওয়াত দিয়ে। আওয়ামী লীগের সদস্য ও কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় বেশি করে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে। সামর্থ্য থাকলে হজে যেতে। আওয়ামী লীগের সদস্যদের এখন অনেক বেশি মুসুল্লীর বেশ। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের চেয়ে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের অনেক ব্যবধান।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে সামরিক ফরমান বলে সংবিধানকে যেভাবে ইসলামীকরণ করা হয়েছিল তা অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। এখন ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে ফিরে যেতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু তারপরেও বারবার বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রীকে বলতে হয় ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে ফিরে গেলেও সংবিধানের শীর্ষে 'বিসমিল্লাহ' এবং রাষ্ট্রধর্ম রূপে 'ইসলাম' থেকে যাবে। তাহলে সেটা কোন ধরনের সংবিধান হবে? যতদিন আমরা সেই সংবিধানের রূপ না দেখি কিছুই বলা যাবে না।

আমরা বাংলাদেশের রণধ্বনি নিয়ে ভাবছিলাম। তাই অন্য সব ভাবনা আগামীদিনের জন্যে তোলা থাকুক।

তথ্যসূত্র :

শামসুজ্জামান খান—বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও বর্তমান বাংলাদেশ।
সালাহউদ্দীন আহমদ—ইতিহাস ও ঐতিহ্য।
আবুল মোমেন—বাংলাদেশ আক্রান্ত মুক্তচিন্তা ও মুক্তির চিন্তা।
ফ. র. আলসিদ্দিকি—অভিমত, সাপ্তাহিক চলতি পত্র, ঢাকা ৭ জুলাই, ১৯৯৭।

ফলা, কলকাতা
জুন, ২০১০

বাংলাদেশ: দুই শূদ্রের বিরোধ

বাংলাদেশের যে শূদ্রদের কথা আমরা বলছি তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের বর্ণবিভাজনের সংজ্ঞানুযায়ী শূদ্র তো বটেই, বর্ণবিভাজনের বাইরে যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে নিম্নতর অবস্থানে রয়েছেন তারাও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া অন্য এক ধর্মের শূদ্রদের কথাও আমরা বলছি। বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এক কথায় এদের ' শোষিত' শ্রেণী বলে চিহ্নিত করেন। তাঁরা দুই ব্রাহ্মণ এবং দুই শূদ্রের তত্ত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা যাদের ব্রাহ্মণ বলতে চান তাদের অন্য নামে তাঁরা বলেন ' শোষক', আমরা তাদের চিনি। তাদের তেমন প্রয়োজন নেই আমাদের। কিন্তু যারা শূদ্র তাদেরকে আমরা চিনি। তাদের কথাই কিছু বলতে হয় আমাদের। বুদ্ধিজীবীরা যে ব্রাহ্মণদের কথা বলেন তারা দু'ভাগে বিভক্ত। হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান ব্রাহ্মণ। এখানেও বর্ণবিভাজনের কোন শর্ত মানা হয়নি। তাদেরই ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে যারা রয়েছেন শোষকের দলে। হিন্দুদের তবুও একটা বর্ণবিভাজন আছে। ব্রাহ্মণত্বের সংজ্ঞা বিস্তৃত করে সব উচ্চবর্ণের শোষকদের না হয় সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই বিভাজন অনেক উদার। মুসলমান ব্রাহ্মণ বলতে তাই আমরা শুধু খানদানী আশরাফ মুসলমানদের কথা বলছিনা, অনেক নও-আশরাফদের কথাও বলতে চেয়েছি। এই ব্রাহ্মণরাই এখন বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি—রাষ্ট্র সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। বাংলাদেশে তারা বিশিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তারাই এখন আসল ব্রাহ্মণ। তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু সেই দ্বন্দ্বে তাদের ব্রাহ্মণত্বে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করেনা, কিছু হিন্দু ব্রাহ্মণও বাংলাদেশে আছেন, বর্ণ বিভাজনে যারা ব্রাহ্মণ তারা প্রায় বিলুপ্ত, না হলে নখদন্তহীন। শ্রেণী অর্থে বুদ্ধিজীবীরা যাদের ব্রাহ্মণ বলেন সেই হিন্দু ব্রাহ্মণদের সংখ্যা এত নগণ্য যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে তাদের কোনও ভূমিকাই নেই। এই ব্যাপারে তারা কোনও উৎপাদক-ই নন।

ব্রাহ্মণদের কথা আপাতত থাকুক।

আমরা শূদ্রদের কথায় চলে যাই এবার। বাংলাদেশে মুসলমান শূদ্ররাই এখন বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের কিছু সংখ্যককে খুঁজে পাওয়া যাবে রাজধানীতে। বড় বড় শহরে-বন্দরে। কিন্তু অধিকাংশের বাস গ্রামে-গঞ্জে, তারা শুধু কৃষকই নন। অনেকেই জমির মালিক, মহাজন, ইউনিয়ন ও উপজেলা (পূর্বের থানা) পর্যায়ে ক্ষমতাশালী মুসলমান। তাদের শূদ্রের দলে ঠেলে দেওয়া হলেও হিন্দু শূদ্রদের সাথে তাদের পার্থক্যটা একেবারে মৌলিক। মুসলমানদের চেয়ে আমাদের বেশি প্রয়োজন হিন্দু শূদ্রদের। তাদের কথাই এবার বলছি। ১৯৪৭ এ ভারত ভাগ এবং সেই সাথে বাংলা বিভাগ। তখন রাজনৈতিক, সামাজিক

এবং সাম্প্রদায়িক কারণেই হিন্দু ব্রাহ্মণরা দেশত্যাগ করেন দলে দলে। একই কারণে বিপুল হিন্দু শূদ্রদেরও দেশত্যাগ করতে হয়। সেই দেশত্যাগের পেছনে যত না ছিল সামাজিক কারণ তার চেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক কারণ। তখন পুর্ববাংলার গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে যায় হিন্দু ব্রাহ্মণ-শূদ্রদের দেশত্যাগে। তারপর আনে পঞ্চাশের অবর্ণনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আবার হিন্দুদের দেশত্যাগ। এবার শূদ্রদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে তখন অনেক মুসলমান শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব পেয়ে যায়। তাদের সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। যাদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হওয়ার সুযোগ ঘটেনা, তারাও তখন ফায়দা তুলে নেয়। এইসব মুসলমান শূদ্রদের সামনে হিন্দুদের দেশত্যাগে সৌভাগ্যের নতুন দুয়ার খুলে যায়। নিরাপত্তার নামে হিন্দু শূদ্রদের দেশত্যাগ তাদের কাছে অভিনন্দিত হয়। তারা তাদের দেশত্যাগে বেশি করে উৎসাহিত করেন। অনেকে তাদের নিরাপদে সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দেন। ধীরে ধীরে এর মধ্যে বয়ে যায় পূর্ববাংলার পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-কর্ণফুলী দিয়ে অনেক পানি (জল নয়)। ঘটে যায় অনেক ঘটনা। আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৫ তে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। পাকিস্তানী জজবা তখন সাম্প্রদায়িকতার শীর্ষবিন্দুতে। সব হিন্দু ব্রাহ্মণ শূদ্ররাই চিহ্নিত হয় পাকিস্তানের শত্রুরূপে। সেইসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে কোনও আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান শূদ্ররা সেই যে সৌভাগ্যের পরশমণি খুঁজে পান কোনও মূল্যেই তারা আর তা হারাতে রাজী হননি। বার বার তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসে সেই পরশমণি। হিন্দু ব্রাহ্মণ-শূদ্রদের সম্পদ দখল করে অনেকে ব্রাহ্মণত্বেও উন্নীত হয়। এই বিষয়ে তাদের 'উদার' ধর্ম কোনও বাধা সৃষ্টি করে না। অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যান নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে। পূর্ব বাংলার গ্রামে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—'গত বছর ছিলাম জোলা, এ বছর হয়েছি শেখ, সামনের বছর পাটের দাম পেলে হবো সৈয়দ'। সৈয়দ তো ব্রাহ্মণই। কোনও মুসলমান শূদ্র এভাবে ভাবতে পারলেও হিন্দু শূদ্রের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কোনও ভাবেই নয়, মুসলমান শূদ্ররা শুধু গ্রামে গ্রামে হিন্দু শূদ্রদের (যতটা সম্ভব ব্রাহ্মণদেরও) জমি-জিরাত, বসতবাটি, ফলের বাগান, পুকুর দখল করে নিজেদের ভাগ্যকে নতুনভাবে গড়ে তোলেনি, সেই সব রক্ষা করার মানসে হয়ে উঠেছে চরম সাম্প্রদায়িক। সব সাম্প্রদায়িকতা সব সময় চোখে পড়ে না। লুকিয়ে থাকে মনের গভীরে। একটু দোলা দিলেই তা দিনের আলোয় বেরিয়ে আসে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানী জমানা, ১৯৭১ এ পাকিস্তানের পূর্ব অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। তার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের। সেই সময় ভারতের বিপুল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল বাংলাদেশকে মুক্ত করতে। সেই সময় পাকিস্তানীরা পূর্ববাংলায় যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল কোনও সভ্য জাতির ইতিহাসে তেমন ঘটনা ঘটেনি। পাকিস্তানী হানাদার সামরিক এবং আধা সামরিক বাহিনীর মূল টার্গেট ছিল হিন্দুরা, তারা চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দু শূন্য করতে। তারা ভেবেছিল এই ভাবেই 'মুসলিম বাংলা'কে রক্ষা করা যাবে। সেই সময় পূর্ব বাংলা হিন্দুদের কাছে হয়ে উঠেছিল জাহান্নাম। নরকের শাস্তির কথা তারা কিছুটা জানলেও জাহান্নামের কথা তারা জানত না। সেই সময় হিন্দু পুরুষদের 'বিশেষ চিহ্ন'

দেখে শনাক্ত করে বধ করা হচ্ছিল। হিন্দু নারীদের করা হত ধর্ষণ। তারা তখন 'গণিমতের মাল'। তাদের ধর্ষণ করার পক্ষে তখন ফতোয়া দিয়েছিলেন অনেক বাঙালি মশহুর পীর-মওলানা-আলেমরা। ইসলাম ধর্মে কাফের-নারীদের ধর্ষণ করা জায়েজ। ১৯৭১ এ সেই জাহান্নাম থেকে প্রায় এক কোটি শরণার্থী জীবন এবং সম্ভ্রম বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত তাদের সবরকম সাহায্য এবং উপযুক্ত ত্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। পৃথিবীর কোনও দেশের মহাদুর্যোগে ও সেই দেশের এক কোটি নাগরিক ভিন্ন দেশে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এমন নজীর ইতিহাসে নেই। পৃথিবীর অনেক দেশের জনসংখ্যাই তো এর সমতুল্য নয়। এই সব শরণার্থীদের নব্বই শতাংশই ছিল অমুসলমান। অবশিষ্ট যে দশ শতাংশ মুসলমানকে সাময়িকভাবে হিজরত করতে হয়েছিল ভারতে তা ছিল মূলত রাজনৈতিক কারণে। তাদের অনেকে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হওয়ার আগেই ফিরে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। যেসব মুসলমান পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সবরকম ভয়-ভীতির মধ্যেও তাদের শাসন মেনে নিয়েছিল, তাদের ভেতর থেকেই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সাহায্যকারী রূপে জন্ম নিয়েছিল রাজাকার-আলবদর-আল শামস বাহিনী। তাদের হাতেও কম হিন্দু বধ হয়নি। পাকিস্তান তার অখণ্ডতা ধরে রাখতে পারেনি। তাকে পরাজিত হতে হয়েছিল বড় করুণভাবে। সে ইতিহাস তুলে ধরার সুযোগ এখানে নেই। দেশ শত্রুমুক্ত হলে ভারতে আশ্রিত শরণার্থীরা ঘরে ফিরে যায়। কিছু অংশ অবশ্য আর স্বদেশে ফেরেনি। তারা কোনও সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই ভারতের জনারণ্যে নিজেদের স্থান করে নেয়, তাদের কথা আমরা বলছিনা। কিন্তু যে বিপুল সংখ্যক হিন্দু শরণার্থীরা বাংলাদেশে ফিরে যায় তাদের ফিরে যাওয়া সেখানে অভিনন্দিত হয়নি। তারা সেখানে ফিরে গিয়ে নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সেখানকার মুসলমান শূদ্ররা তাদের আপদ বলে মনে করে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছিল। জায়গা জমি-বসতবাড়ি বেদখল হয়ে গিয়েছিল। সেসব যে শুধু রাজাকার-আলবদরদের দখলেই গিয়েছিল তা নয়। গ্রামের দিকে বরঞ্চ তাদের দাপট কমই ছিল। এরা হবে মুসলমান ব্রাহ্মণ এবং গ্রামাঞ্চলে মুসলমান শূদ্ররাই সেইসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। গ্রাম বাংলায় সেইসব সম্পত্তি দখলমুক্ত করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের যথাযোগ্য ভাবে পুনর্বাসিত করা ছিল সরকার এবং প্রশাসনের ঘোষিত নীতি। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে স্থানীয় প্রশাসন নানা রকম সমস্যার মুখোমুখি হয়। সেই সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল স্থানীয় মুসলমান শূদ্ররা। তারা স্বেচ্ছায় সেই দখল করা সম্পত্তি ছেড়ে দিতে অসম্মত হয়। এই সমস্যা থেকেই সৃষ্ট হয় নতুন রাজনীতি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন মুসলমান ব্রাহ্মণদের সাথে বিপুল সংখ্যক শূদ্রও। যারা তা চায়নি তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কারণ দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অর্থনৈতিক দুঃশাসনে অনেক পাকিস্তান প্রেমিকেরই খোয়াব ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও ধর্মনিরপেক্ষ দেশের খোয়াব দেখেনি। তাদের চেতনায় স্বাধীন বাংলাদেশের যে তসবির ছিল তা পুরোপুরি মুসলিম বাংলার। আগে যে সব হিন্দুরা দেশ ছেড়েছে তার ফলে তারাই লাভবান হয়েছে। সেইসব তো চুকেবুকে গেছে। ১৯৭১-এ যে সব হিন্দুরা সাময়িক ভাবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা কামনা করেছিল ওরা যেন আর ফিরে না আসে। ভারতেই থেকে যায়।

তাহলে তাদের দখল করা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আর ফিরিয়ে না দিয়ে রক্ষা করা যায়। ওদের পরিত্যক্ত সম্পদ শুধু নয়, ওদের ফেলে যাওয়া চাকুরী, ব্যবসা সব কিছুই ভোগ করা যায় নবলব্ধ স্বাধীনতার সাথে। তাদের কাছে সেটাই মনে হয়েছিল অর্থবহ স্বাধীনতা বলে। এই মানসিকতা থেকে বাংলাদেশে যে নতুন সমস্যা তৈরী হয়—তাতে ইন্ধন জোগায় কোনও কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং দল। পত্র-পত্রিকা নানারকম প্রচার চালায়। তারা দাবি করে একাত্তরে যেসব হিন্দুরা দেশত্যাগ করেছে শুধু তারাই নয়-যারা সাতচল্লিশে, পঞ্চাশে, আটান্নতে, বাষট্টিতে, চৌষট্টিতে, পঁয়ষট্টিতে দেশত্যাগ করেছে তারাও দলে দলে ভারত থেকে ফিরে এসে পুরাতন সম্পদ দাবি করছে, যা তারা তখন ফেলে গিয়েছিল। এই প্রচার ছিল একান্তই ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই ধরনের অপপ্রচার এমন পর্যায়ে চলে যায় যে এক সময়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত বিবৃতি দিয়ে বলতে হয়, ১৯৭১ এর আগে দেশত্যাগ করা কোনও শরণার্থীকে গ্রহণ করা হবে না।

সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার সেই সমস্যা থেকে বাংলাদেশে স্বাধীনতার উষালগ্নেই শুরু হয়ে যায় নতুন করে চরম হিন্দু বিরোধিতা এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। যার সাথে জড়িত করা হয়েছিল ভারত বিরোধিতার রাজনীতি। সেই রাজনীতি আমাদের আলোচনার বাইরে।

বাংলাদেশে যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, আর যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বামপন্থী বলে মনে করেন, তাঁরা যে দর্শনের কথা বলেন, তাতে একটা ফাঁকি রয়েছে বলে মনে হয় আমাদের। তাঁরা বলে থাকেন দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে যত বিরোধই থাকুক শূদ্রদের মধ্যে তা নেই। বিভেদ নেই বলেই মুসলমান শূদ্র অমুসলমান শূদের বন্ধু, সমব্যথী, আপনজন। ধর্ম দিয়ে যেখানে দুই শূদ্রকে আলাদা করা হয়েছে সেখানে এই তত্ত্ব যে মিলবে না তা স্বীকার না করে তারা মরুভূমির বালিতে উটের মত মুখ গুজে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন মুসলমান শূদ্ররা দীর্ঘদিন হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বারা শোষিত-বঞ্চিত-অপমানিত হয়েছে বলেই তাদের বেলায় একটা জন্মগত ক্রোধ ওদের থাকতেই পারে, কিন্তু হিন্দু শূদ্রদের ওরা আপনজন বলেই ভাবে। তারা ভুলে যান হিন্দু ব্রাহ্মণরা যখন শোষণ-অত্যাচার করেছিলেন শূদ্রদের ওপর, তখন তারা কে হিন্দু কে মুসলমান তার বিচার করেননি। শোষণটাই ছিল লক্ষ, জাতবিচার নয়, এখন তো তারা নেই। দু একজন থাকলেও তাদের 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার' এর অবস্থা। তাদের প্রসঙ্গ টেনে এনে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের দুই শূদ্রের বর্তমান অবস্থানকে কী আর বিশ্লেষণ করা যাবে। তত্ত্ব যাই বলুক বাংলাদেশে এখন আর মুসলমান শূদ্ররা হিন্দু শূদ্রদের বন্ধু বলে ভাবে না। (কোনও দেশে কি ভাবে?)। ভাবতে পারে না। তারা যেন এখন নিজেদের আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে। তারা মনে করেন তারা ভুলে গিয়েছিল সেই পরিচয়।

পাকিস্তানী জমানায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ব্রাহ্মণদের (শূদ্রদেরও) সাধারণ শত্রু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা। পবিত্র ইসলাম ধর্ম দুই পাকিস্তানীদের এক বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ব্রাহ্মণদের সেই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিন্দুদের পাশে পাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ জনসংখ্যার বিচারে হিন্দু ব্রাহ্মণ-শূদ্রদের অবস্থান উপেক্ষণীয় ছিল না। যেই অখণ্ড পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে গেল হিন্দুদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। স্বাধীন বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রকাশের সাথে সাথে দেশে শুরু হয়ে গেল রাজনীতির নতুন মেরুকরণ। দেশের জন্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ

সংবিধান তৈরী হল বটে তবে তিন বছরের মধ্যেই তার রূপ বদলে গেল। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা অপসারিত হলো। আওয়াজ উঠলো ইসলামী বাংলার। এই সব নিয়ে এখানে আমরা কোনও আলোচনা করবো না, আমরা ফিরে যাই শূদ্রদের কাছে।

পাকিস্তানী জমানায় সারা দেশকে ইসলামী জজবায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে মুসলমান শূদ্ররা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। একটা ঘোরের মধ্যেই যেন পাকিস্তান ভেঙে যায় তাদের চোখের সামনে। সাময়িকভাবে তাদের সেই ঘোর কেটে গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই তারা আবার ইসলামী জোসে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মোল্লা-মওলানা-আলেমরা সেই জোশ জাগিয়ে তুলতে আবার মাঠে নেমে পড়েন। তাঁরা আল্লাহ-রসূলের ওপর নির্ভর করতে বলেন। যে নির্ভরতায় 'রাম-রহিম না জুদা কর ভাই' বলে কিছু নেই। তাঁরা বলেন অমুসলমানরা সব কাফের। হিন্দুরা সব পুতুল পূজারী, আখেরাতে তাদের জন্যে পাওনা রয়েছে চরম শাস্তি। সেটাই আল্লাহর কোরানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। মোমিন মুসলমান কখনও কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারেন না। তা করলে মুসলমানের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। যাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে মুসলমানদের ঈমান নিয়ে প্রশ্ন উঠে তারাই হল বাংলাদেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী। তাদের শুধু তখনই বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যায়—যদি তারা ইসলাম কবুল করে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। যেমন তাদের অনেকেই ১৯৭১ এ কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু তারা এমনই মোনাফেক যে পাকিস্তানী শত্রুরা চলে যাওয়ার সাথে সাথে তারা ইসলাম ত্যাগ করে ফিরে যায় সেই পুতুল পূজার ধর্মে! যারা এভাবে ইসলাম ছেড়ে চলে গেছে তারা তো আসলে মুরতাদ। তাদের যে মুরতাদের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া হয়নি সে তো তাদের জন্যে পরমতম করুণা। আল্লাহ পরম দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। তিনি রহমানুর রহিম।

বাংলাদেশের বাম বুদ্ধিজীবীরা বলেন সাম্প্রদায়িকতা হলো দুই ব্রাহ্মণের স্বার্থের সংঘাত। মধ্যবিত্তের বিরোধ। এতে শূদ্ররা নেই। কিন্তু বাংলাদেশের শূদ্রদের মধ্যে এখন যে ভাবনা-চিন্তা দেখা যায় তাকে যদি সাম্প্রদায়িকতা না বলি তাহলে তাকে কী বলা যায় আমরা জানিনা। বাংলাদেশে হিন্দু শূদ্ররা এখন চরমতম সাম্প্রদায়িকতার শিকার। মুসলমান শূদ্ররা এত সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল কেন? তার মূল কারণ বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে এখন মৌলবাদের রমরমা, এই মৌলবাদ মুসলমান শূদ্রদের আবহমান প্রবাহিত লোকজ ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শূদ্ররা হতদরিদ্র ও তারা শোষিত, কিন্তু তারা 'সাচ্চা মুসলমান' তাদের এই জীবনে কিছু না পাওয়াটা আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি মহান, তিনি করুণাময়। আখেরাতে তিনি তাদের পুরস্কৃত করবেন। তারা দরিদ্র হলেও তারা যে শোষিত সেটা তাদের বুঝতেই দেয়না মুসলমান ব্রাহ্মণরা। তাদের যত বেশি সাম্প্রদায়িক করে তোলা যাবে ততই তাদের লাভ। সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষে নীল হয়ে বাংলাদেশে এখনো অবশিষ্ট যেসব হিন্দু শূদ্র আছে গ্রামেগঞ্জে তারা সেখানে মাটি, কামড়ে পড়ে না থেকে দেশত্যাগ করবে, না হলে অন্তত নিরাপত্তার জন্যে গ্রামের সব সম্পত্তি পরিত্যাগ করে নগরে গিয়ে আশ্রয় নেবে। নগরে তাদের আলাদা করে কেউ খুঁজে পাবেনা সহজে। তাদের পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পানির দরে কিনে নেওয়া সহজ হবে নতুন মুসলমান ব্রাহ্মণদের পক্ষে। অনেকের পক্ষে আইনের বেড়াজালে পড়ে সম্পত্তি বিক্রি করা সম্ভবও হবে না। সেসব অনায়াসে দখল করে নেওয়া যাবে। এমনিভাবে

অতি সহজেই হিন্দুদের শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যাবে। দেখা যাবে রাষ্ট্রক্ষমতার ছিটেফোঁটা ক্ষমতাও যদি হাতে থাকে তাহলে সহজে লাভের কড়ি ঘরে তুলে নেওয়া যায়। তাই গ্রামের নতুন মুসলমান ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে হিন্দু ব্রাহ্মণ-শূদ্রদের দেশত্যাগে। তাহলে মুসলমান শূদ্ররা কী করবে, তারা আরও বেশি করে মুসলমান হতে চাইবে, যাতে এই জীবনেই আল্লাহর কিছু করুণাধারা অন্তত নেমে আসে।

কয়জন খোঁজ রাখেন জানিনা, বাংলাদেশে মুসলমান শূদ্ররা এখন কোনও হিন্দুর ঘরেই অন্ন গ্রহণ করে না, হিন্দু দোকান থেকে কেনা মিষ্টি পর্যন্ত খায় না। কারণ তাদের রান্না করা খাদ্য নিষিদ্ধ না হলেও হালাল নয়। হিন্দুরা বেদ্বীন, তারা কাফের, তারা অপবিত্র। কোরান তাদের সেই শিক্ষা দিয়েছে। তাদের বাড়িতে বিসমিল্লাহ বলে পশু-পাখি জবাই করা হয়না। তাই হিন্দু বাড়িতে রান্না করা মাছ-গোশত (মুসলমানরা মাংস খায় না) খাওয়া, বেনামাজীদের তৈরী করা মিষ্টি, খাওয়া হারাম খাওয়ার সমতুল্য। এ যেন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের সেই ছুৎমার্গের ভূত।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে মৌলবাদ থেকে সৃষ্ট মুসলমান শূদ্রদের সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুদের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। যে কোনও সাম্প্রদায়িক সংকটে মুসলমান ব্রাহ্মণরা তাদের ব্যবহার করে। এই সাম্প্রদায়িকতা তাদের মনের গভীরে এতটাই ঢুকে গেছে যে তার শিকড় উপরে ফেলা আর বোধ হয় সম্ভব নয়। তাই সেই দেশে দিনে দিনে গ্রামের হিন্দু পল্লী ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুরা দেশত্যাগ করছে। যারা পারছে না তারা রাজধানীতে, শহরে-বন্দরে নতুন আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে। বাংলাদেশের দুই শূদ্রের এই বিরোধকে প্রগতিশীল, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে গেলে একটা বড় ভুল করা হবে বলে আমাদের মনে হয়।

দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে কিন্তু ছুৎমার্গের কোনও সমস্যা নেই। মনে যাই থাকুক তারা নিশ্চিন্তে একে অন্যের বাড়িতে আহার করে পরম তৃপ্তি পান। মুসলমান ব্রাহ্মণরা এই যে শূদ্রের মত ছুৎমার্গের সমস্যায় নিজেদের সম্পৃক্তা না করে, নিজেদের ওপরে তুলে নিলেন তার কারণ কি? তাহলে কী তারা সব অসাম্প্রদায়িক হয়ে গেলেন? এর উত্তর, এতক্ষণ যা আমরা তুলে ধরলাম তার মধ্যেই রয়েছে। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর অন্য একটা ব্যাখ্যা আছে। তা থাকুক। মুসলমান ব্রাহ্মণরা আধুনিক সংস্কৃতিতে আস্থাবান হয়েও শূদ্রদের ঠেলে দিচ্ছেন ইসলামের তথাকথিত 'মহান' তাহজীব-তমুদ্দিনের দিকে। তাদের একটা উদ্দেশ্য হলো মুসলমান শূদ্রদের (ব্রাহ্মণ তো প্রায় নেই বলা চলে) যাতে তারা ঘৃণা করে সেই ভাবে তাদের মন তৈরি করা। যে ঘৃণা থেকে জন্ম নেবে সামাজিক বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, যার হাত ধরে চলে আসবে হিংসা। যাতে আখেরে মুসলমান ব্রাহ্মণরাই গোলায় তুলে নিতে পারেন ক্ষেতের সব ফসল।

যাঁরা বাংলাদেশে দুই শূদ্রের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই বলে মনে করেন, তাঁরা বাস্তব থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। তাঁরা কী একবার তাদের 'তত্ত্বের আকাশ' থেকে নেমে এসে বাস্তবের মাটিতে পা রাখবেন?

শারদীয়া অঞ্জলি,
ঢাকা, আশ্বিন, ১৪১৭

বাংলাদেশ : ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ

বাংলাদেশ একটি বিচিত্র দেশ, সে দেশের বুদ্ধিজীবীরা বলেন সব সম্ভবের দেশ। সম্প্রতি সে দেশে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদন লাভ করেনি। সেই আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়ে গেছে। নতুন সেই শিক্ষানীতির একটা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। আমরা তা নিয়ে বিস্তারিত বিবরণে যাবো না। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। আমরা শুধু এই শিক্ষানীতির মূল চেতনা নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। সেই সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের ক্রান্তিকালের কিছু নির্বাচিত পর্যায় দেখে নিতে চেষ্টা করবো। বাংলাদেশের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণগুলি আমাদের আলোচনাকে বুঝাতে সহায়তা করবে।

এক. ২৬ মার্চ ১৯৭১, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর পর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ।

দুই. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়।

তিন. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রথম বিজয় দিবসে বাংলাদেশের নতুন সংবিধান বলবৎ। যার চার মূলনীতি হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

চার. ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রতিবিপ্লবী কিছু সাম্প্রদায়িক সেনা অফিসারদের হাতে সপরিবারে নিহত।:

পাঁচ. ২২ এপ্রিল, ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক সামরিক ফরমান বলে সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন। ধর্মনিরপেক্ষতা অপসৃত। তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। তাছাড়া সংবিধানের শীর্ষে সংযোজন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এই শব্দবন্ধ।

ছয়. ৭ জুন, ১৯৮৮ রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ নিয়ন্ত্রিত সংসদে সংবিধানের অষ্টম সংশোধন বিল পাশ। বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম'।

বাংলাদেশের সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রহরণ করে ইসলামীকরণের কাজ শুরু করেছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক ক্ষমতা

প্রয়োগ করে। জেনারেল এরশাদ সামরিক ক্ষমতাকে আড়ালে রেখে সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রথম জেনারেল সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত। অন্য জেনারেল এখন গণতন্ত্রী সরকারে মহাজোটের শরিকদল হয়ে ক্ষমতার অংশীদার।

জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর কমান্ডার বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তাঁর মনে হয়েছে, সংবিধানের মৌলিক আদর্শ ও বিধান সম্পর্কে জনমনে অসন্তোষ রয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোনো অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ছিল না। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছিল একটি 'মুসলিম বাংলা' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। যে দেশে শুধু মুসলমানরাই হবে রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। বাহাত্তরের মূল সংবিধানে জাতীয়তাবাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বলে। জেনারেল জিয়া তাকে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-এ রূপান্তরিত করেন। যে জাতীয়তাবাদের অন্য নাম 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ'।

জেনারেল এরশাদ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ব্যস্ত ছিলেন পাকিস্তানের খেদমত করতে। ক্ষমতা দখল করে তিনি আবিষ্কার করেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের (ইসলাম) প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা। এরশাদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশে নয়া সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইসলাম, সেজন্যেই তাঁর ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম রূপে সংবিধানে যথাযোগ্য মর্যাদাদান।

আমরা ওপরে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছি। হয়তো এ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরম্পরা ঠিকমতো অনুধাবন করা যাবে না। কিন্তু যে ইতিহাস এর মধ্যেই বহুচর্চিত আমরা তা নিয়ে কোনো আলোচনায় যেতে চাই না। আমরা যা নিয়ে কিছু বলতে চাই তার পটভূমির জন্যেই শুধু এই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতে হলো।

দুই

বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা জনগণের বিপুল রায় নিয়ে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসেন ২০০৯-এর জানুয়ারিতে। তার আগে ২৯ নভেম্বর, ২০০৮-এ সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে তাঁর নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মহাজোট সংসদে তিন চতুর্থাংশ আসন লাভ করে। তাঁর নিজের দল আওয়ামী লীগ একক দল হিসেবে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী হয়। এই মহাজোট জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি এক শরিকদল। রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা স্থায়ী মিত্র বলে কেউ থাকে না। শেখ হাসিনাও সেই নীতিতে বিশ্বাসী। নির্বাচনী বিজয়ের পর সরকার গঠনে কোনো দলের প্রয়োজন না থাকলেও শেখ হাসিনা সব দলকে নিয়েই সরকার গঠন করেছেন, কোনো দলকে মন্ত্রীত্ব থেকে বঞ্চিত করেননি।

ক্ষমতা গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন "বাংলাদেশ বাহাত্তরের (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২এ কার্যকর) ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানে ফিরে যাবে।" দেশের সব জাতীয় দৈনিকে সেই ঘোষণা প্রকাশিত হয় ৭ নভেম্বর, ২০০৯এ। সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। স্বাভাবিকভাবে জেনারেল জিয়ার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এবং প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তাদের জোটসঙ্গী জামাতে ইসলামী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং দেশকে অচল করার হুমকি দেয়। বাহাত্তরের সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে তাকে প্রথম ক্ষতবিক্ষত করেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিএনপি কী করে মেনে নেয় বাহাত্তরের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে ফিরে যাওয়াকে? জামাতে ইসলামী তো আদর্শগতভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বীকার করে না। তাদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো ইসলামমুক্ত অপবিত্র শাসনব্যবস্থা, কাফেরদের মতবাদ। তারা মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতার আরেক অর্থ হলো নাস্তিক্যবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বীকার করে নিলে মুসলমান থাকা যায় না, আল্লাহর সাথেও তার কোনো সম্পর্ক থাকে না, এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েও কোনো কার্যকর পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে গেলেন না। বরঞ্চ তিনি যেন কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে তাঁর কোনও মন্ত্রীর মুখে শোনা যায় বাংলাদেশ বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে গেলেও সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বহাল থাকবে। কেউ কেউ আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন—রাষ্ট্রধর্ম রূপে ইসলামও বহাল থাকবে। সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ...' থাকবে, থাকবে রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম', তারপরও সেই সংবিধান হবে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ? এ যেন কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে এখন যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা তাতে আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার মতো ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। এই নিয়ে শেখ হাসিনা যাই ভাবুক না কেন তাঁর নিজের দলেও অন্তর্দ্বন্দ্ব কম নেই। আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতা ভোগ করতে চায় নিরঙ্কুশভাবে। নতুন করে কোনো বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়ে তারা ক্ষমতা হারাতে চায় না। জনগণ তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাদের মতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত দলের জন্যে হঠকারী হতে পারে। তাছাড়া আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা-কর্মীদের শতকরা কত অংশ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে নিবেদিত প্রাণ সে প্রশ্নও সঙ্গত কারণে উঠে আসে। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে আসা না-আসায় দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর কিছু আসে যায় না। কিন্তু সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিস্থাপিত হলে দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমমর্যাদা সাংবিধানিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সেই মানসিকতা থেকে এখন অনেক দূরে। ১৯৭৭ থেকে ২০১০ ইতিহাসের নিরিখে খুব দীর্ঘ না হলেও রাজনীতির বিচারে অনেকটা সময়, বাংলাদেশের সাধারণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনে সংবিধান থেকে যখন ধর্মনিরপেক্ষতা পরিত্যক্ত হয় তখন যেমন কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না, এখন সেই মূলনীতিকে ফিরিয়ে আনার প্রশ্ন যখন উঠেছে তাতে তাদের কোনো উৎসাহ নেই।

অনেকে তো এখন এই প্রশ্নও তুলেছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে যা উল্লেখ করা হয় তার মধ্যেই একটা ফাঁকি ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে অবমূল্যায়ন না করেও বলা যায়, তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোনো বোধ বা ধারণা ছিল না। পাকিস্তানের লাগামহীন অর্তনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ থেকে তারা মুক্তি চেয়েছিলেন, পাকিস্তানের মুসলিমমানস থেকে নয়। অনেকের কাছে তো আবার ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হয়ে উঠেছিল সংখ্যালঘু হিন্দুদের আধিপত্যে ফিরে যাওয়া। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের, সেই সাথে সাধারণ জনগণকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। তখনকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের, তারা তা করেননি, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জীবনের সর্বস্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিফলন নিয়ে তাদের মনেও দ্বিধা ছিল। বাস্তবে তারা সকলে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে আন্তরিক ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। এই আলোচনার প্রেক্ষিত বিশাল। আমরা তাই এখানে এই ব্যাপারে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে চাই না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই মহৎ অর্জন দিয়ে সে সময় দেশের প্রগতিশীল, সচেতন বুদ্ধিজীবীরা যে দায়িত্ব পালন করেছেন বিশ্বের কোনো দেশে তার উদাহরণ নেই। আশার কথা তাঁরা হাল ছেড়ে দেননি। বাংলাদেশের সংবিধানকে আবার তারা হারানো গৌরবে গৌরবান্বিত করার প্রয়াস তাঁরা চালিয়েই যাচ্ছেন। কিন্তু রাজনীতিতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাঁদের প্রভাব আর কতটুকু।

তিন

যে কোনো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিরক্ষাবাহিনী থাকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কর্তৃত্বাধীনে। বাংলাদেশে সেই ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। এই দেশে বছরের পর বছর জেনারেলরা ক্ষমতায় থাকেন। আর যখন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে তাদের অলিখিত আনুগত্য থাকে সেনাবাহিনীর কাছে। সেনাবাহিনী না চাইলে কোনো রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারে না। এটাই বাংলাদেশের প্রবহমান ঐতিহ্য। তাছাড়া জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে, দেশকে পরিপূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে তাঁদের মাঝে মাঝে সেনানিবাস ছেড়ে বাইরে চলে আসতে হয়। উৎখাত করতে হয় রাজনৈতিক সরকারকে। দখল করতে হয় রাষ্ট্রক্ষমতা। তারপর তারা জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে, গঠন করেন দল, নির্বাচনের নামে তামাশা করেন, 'নির্বাচিত প্রতিনিধি' হয়ে শাসন করেন দেশ, সবকিছুই করেন দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে। এই সেনা-রাজনীতিবিদদের কোনো শুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা নেই। বাংলাদেশ-সেনাবাহিনীতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার কোনো শিক্ষা নেই। যেই শিক্ষা তাদের দেওয়া হয় তা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক, যে ইসলামী শিক্ষা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক যেমন কোরান শিক্ষা, যে শিক্ষায় কোনোরূপ পরধর্ম সহিষ্ণুতা নেই, নেই কোনো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় 'একজন মুসলমান দশজন অমুসলমানের সমান', 'ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে.... বাংলাদেশ থেকেই

আবার ইসলাম জিন্দা হবে...', ধর্ম হিসেবে ইসলাম থাকবে সবার শীর্ষে। বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ..." ধর্মের ব্যাপারে, অবশ্যই ইসলাম ধর্ম, কোনোরকম মুক্তচিন্তা সেখানে বরদাস্ত করা হয় না। নিজেকে একজন স্বাধীন মানুষরূপে ভাবার কোনো অবকাশ সেখানে নেই। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সেইভাবে গঠন করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে সৃষ্টির প্রথম মানব হজরত আদম থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলমানই স্থান-কাল নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িকতা হলো মুসলমানের ইমানের অঙ্গ। তারা হলো আল্লাহর সাচ্চা বান্দা। অবিশ্বাসীদের (যারা আল্লাহ-রসূলের ওপর বিশ্বাস রাখে না) ইসলামের পতাকার নিচে নিয়ে এসে আখেরাতে তাদের জন্যে মুক্তির পথ প্রশস্ত করাই হলো আল্লাহর সাচ্চা বান্দাদের পবিত্র কাজ। এই সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে যারা অলিখিতভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় শরিক, বাংলাদেশ কি বাহাত্তরের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে ফিরে যেতে পারবে? তাদের খুশি রাখতেই কি মাঝে মাঝে 'বিসমিল্লাহ...'র কথা বলা হয়। উঠে আসে রাষ্ট্রধর্মের প্রসঙ্গও।

চার

শেখ হাসিনার আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ৮ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি তাদের প্রতিবেদনে যে সুপারিশমালা পেশ করেছে তার বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাবো না। দুটি প্রসঙ্গ শুধু তুলে ধরবো আমরা। এই কমিটির দুটি বৈপ্লবিক সুপারিশ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা তুলে দেওয়া। মাদ্রাসা শিক্ষাকে তুলে দিয়ে তাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত করার সুপারিশ করার সাহস না পেলেও মাদ্রাসা শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে আধুনিকীকরণের কথা বলেন তাঁরা, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাকে কি কোনোভাবে পরিবর্তন করা যায়? পরিবর্তন করতে গেলে সেই শিক্ষা আর মাদ্রাসা শিক্ষা থাকে না। মাদ্রাসা থেকে প্রতিবছর যে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে বাইরের বিশ্বে প্রবেশ করছে, তারা হয়ে ওঠে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, যে কোনো জাতির অগ্রগতির পথে অন্তরায়। এই অভিমত বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের। মাদ্রাসায় যে কোরান হাদিস শিক্ষা দেয়া হয় তার ব্যাখ্যা দেন সেখানকার মৌলবী মওলানারা। শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় মুসলমানরাই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জাতি, আল্লাহর দুনিয়ায় তারাই শ্রেষ্ঠ জাতি, অমুসলমানরা সব কাফের। মুসলমানরা কাফেরদের হত্যা করার জন্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত। কোরানে আল্লাহ সেই নির্দেশ দিয়েছেন। যেই কোরান মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম সোপান। যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা জানে শুধু মুসলমানরাই একটি উম্মাহ। অন্য কোনো ধর্মের মানুষ সেই উম্মাহর শরিক নয়। শৈশব থেকে এই ভাবধারায় মানুষ হয়ে যে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা তাদের মনে গেঁথে যায় তারা পরবর্তী জীবনেও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই আমাদের।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার পরিবর্তে ললিতকলা শিক্ষা দেবার সুপারিশ করেন। এই শিক্ষা কমিটি অনেক আপস করলেও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় কিছু মূলনীতি তুলে ধরেছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশ, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে, ৩ জুন, ২০১০-এ। জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করতে পারেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং বিএনপি-জামাত জোট ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলনের হুমকি দেয়ার ফলে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির মূল সুপারিশকে এড়িয়ে গিয়ে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে বাদ দিয়ে সেখানে প্রতিস্থাপন করে 'অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ'।

নির্বাচনে জনগণের এত বড় রায় নিয়েও শেখ হাসিনা ভয় পেলেন। হুমকি দিল কারা? ইসলামপন্থী সব মৌলবাদী রাজনৈতিক দল যারা নিজেরা শতধাবিভক্ত হলেও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নিয়ে তাদের ঐকমত্য আছে। এইসব দলের মধ্যে জামাতে ইসলামীর সাংগঠনিক ভিত্তিও আছে। তাছাড়া রইলো বি এন পি। যে দলের নেতৃত্বে আছেন জেনারেল জিয়ার পত্নী খালেদা জিয়া, তিনি দুবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। যেভাবেই নির্বাচন পরিচালিত হোক না কেন খালেদা জিয়া দশ বছর বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে ছিলেন 'জনগণের রায়' নিয়ে। প্রথমবার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন শেখ হাসিনার কাছে ১৯৯৬'র নির্বাচনে। তখন তিনি খোয়াব দেখছিলেন বাংলাদেশ থেকে 'ইসলাম' হারিয়ে গেছে, মসজিদ থেকে আজানের পরিবর্তে ভেসে আসছে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি। মসজিদে জ্বলছে মঙ্গলপ্রদীপ। এইসব কথা শুনে তখন শেখ হাসিনা সাত-তাড়াতাড়ি 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম' এর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন ইসলামের প্রতি কার আনুগত্য বেশি। ইসলামে নারী-নেতৃত্ব হারাম। খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জোটে জামাতে ইসলামী ছাড়া আরো দুটি চরম মৌলবাদী দল রয়েছে। তাদের খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব মেনে নিতে, সরকারে যোগ দিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। ইসলামও নাপাক হয়ে যায়নি। ইসলামী 'পন্ডিত' (ইসলামী শব্দ নয়, মুসলমানরা পন্ডিত হলে তাদের ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়) যেভাবেই এর ব্যাখ্যা দেন না কেন এর আরেক লক্ষ্য ইসলামের সুবিধাবাদী রাজনীতি। জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন থেকে না হয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরিত্যাগ করে 'অসম্প্রদায়িক চেতনাবোধ সংযোজন করা হলো, কিন্তু খালেদা জিয়া যদি আবার মসজিদ থেকে আজান শুনতে না পেয়ে উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি শোনেন তখন শেখ হাসিনা কি করবেন?

ধর্মকে বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে বের করে নিয়ে এসে পারিবারিক এবং ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা যেন বাংলাদেশ ভাবতেই পারে না। তাই এই শিক্ষানীতিতেও প্রথম শ্রেণী থেকে সকল শিক্ষার্থীর জন্যে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকছে নয়া শিক্ষানীতিতে। রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে কেন? এই প্রসঙ্গ আর টেনে লাভ নেই। বাংলাদেশ তার নিয়মেই চলবে।

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ' এক অর্থ বহন করে না। ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া কি অসাম্প্রদায়িকতাকে ভাবা যায়? নাকি তারাও মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো ধর্মহীনতার ছদ্মবেশ? যেভাবে মনে করে ইসলামপন্থীরা, খালেদা জিয়া। নাকি শেখ হাসিনার সরকার মনে করে 'জনগণ' শিক্ষানীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বরদাস্ত করবে না। হতেও পারে শেখ হাসিনার জন্যে এই ভাবনাকে শুধু রাজনৈতিক দ্বিচারিতা বললে ভুল বলা হবে। এটা আসলে রাজনৈতিক ডিগবাজি। এই যে একবার এগিয়ে আবার পিছিয়ে যাওয়া তা রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা জনগণের জন্যে কোনও মহৎ কল্যাণ বয়ে আনবে না।

শারদীয়া উদয়ন,
নিউইয়র্ক
আশ্বিন, ১৪১৭